



মাসিক

আলোকধাৰা

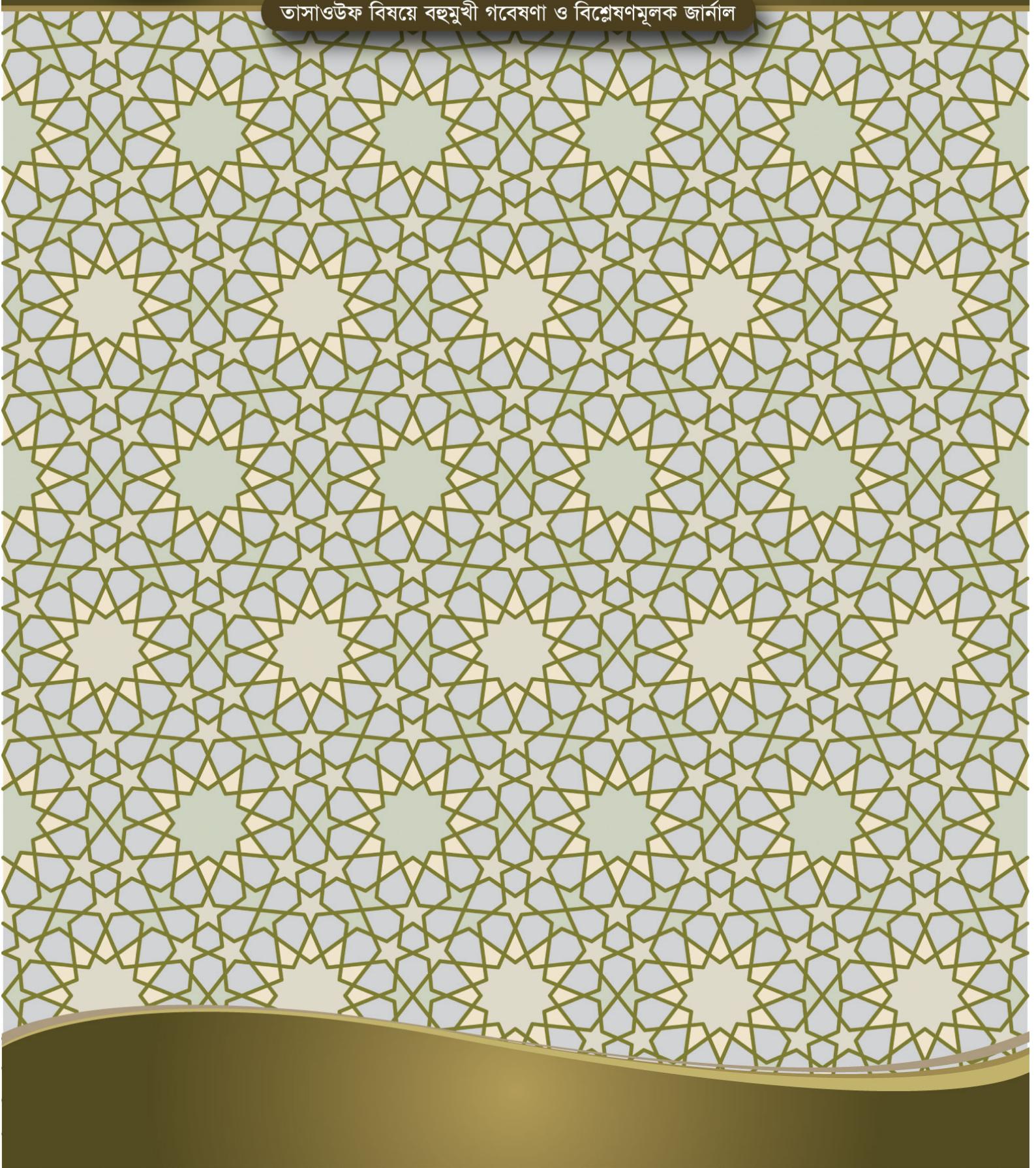
রেজিঃ নং-২৭২

২৪তম বৰ্ষ

২য় সংখ্যা

ত্বেঁæqvwi 2018 Cmvqx

তাসাওউফ বিষয়ে বহুবৃদ্ধি গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল



গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কং)’র ১১২তম মহান ১০ মাঘ উরস শরিফ উপলক্ষে ‘এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট’-এর ব্যবস্থাপনায় ১০ দিন ব্যাপী কর্মসূচি



চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে ‘মিট দ্য প্রেস’-এ বক্তব্য রাখছেন ট্রাস্ট সচিব এ এন এম এ মোমিন।

৩ মাঘ মঙ্গলবার ‘মাইজভাণ্ডার শরিফ শাহী ময়দান’-এ গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কং) এর ১১২তম মহান ১০ মাঘ উরস শরিফ উপলক্ষে উমাতে আহমদী (দণ্ড) মাহফিল’-এ বক্তব্য রাখছেন গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী (কং) এর মন্ডিলের সাজ্জাদানশীল হ্যুরত আলহাজ্ব সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.জি.আ)।



‘চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তন’-এ ‘মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার রূপরেখা : তত্ত্ব ও বাস্তবতা’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী।



‘থিরেটার ইঙ্গিটিউট মিলনায়তন’-এ ‘মাইজভাণ্ডারী একাডেমি’ আয়োজিত ‘বিশ্ব সংকট মোকাবেলায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপের গুরুত্ব শীর্ষক ‘সম্মুতি সমিলন’ এ মধ্যে উপবিষ্ট অতিথিবর্গ।

মাসিক আলোকধারা THE ALOKDHARA A MONTHLY JOURNAL OF TASAWWUF STUDIES

রেজি. নং ২৭২, ২৪তম বর্ষ, ০২ সংখ্যা

ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঈসায়ী
জ্যানুয়ারি ২০১৮ রবিউস সানি ১৪৩৯ হিজরি
মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৪ বাংলা

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

ভারপ্রাণ সম্পাদক
মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

যোগাযোগ:

লেখা সংক্রান্ত: ০১৮১৮ ৭৪৯০৭৬
০১৭১৬ ৩৮৫০৫২
মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্ত: ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০
০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ১৫ টাকা
US \$=2

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:

দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
সৈয়দ সলিমুল্লাহ শাহ রোড, বিবিরহাট
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৮২১১। ফোন: ২৫৮৪৩২৫

 শাহজালাল হ্যারিটেজ সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট-এর একটি প্রকাশনা

Web: www.sufimaizbhandari.org

E-mail: sufialokdhara@gmail.com

সূচী

■ সম্পাদকীয়:

■ তাহকীকুল কুরআন : সুরা আল বাক্সারাহ শরীফ (পর্ব-৮)	২
অধ্যক্ষ আলহাজ্ম মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী	
■ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের জন্মভূমির পরিচয়	৩
জল্লের উল আলম	
■ সোনালী অতীতের কুশলী নির্মাতা : হ্যারত ইবনে মাজাহ	৫
	১০
■ ফীহি মা ফীহি (মওলানা রূমীর উপদেশ বাণী)	১২
ড. সেলিম জাহাঙ্গীর	২৬
■ (ক) বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব	
(খ) বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা : নীতি ও নৈতিকতা চর্চা	
ড. হাফেজ আল্লামা মুহাম্মদ মহিউল হক	৩৭
■ তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরীফ এবং বেলায়তে	
মোতলাকার উৎস সন্ধানে	
জাবেদ বিন আলম	৪২
■ আলোকধারা বুক্স এর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ	৪৭

সম্পাদকীয়...

এবার আলোকধারা প্রকাশিত হবার পূর্বে পবিত্র ফাতেহা-ই-ইয়াজ দওউম এবং ১০ মাঘ গাউসুল আযম মাইজভাঙ্গারীর (কং) পবিত্র উরস্য শরিফ উদ্যাপন সম্পন্ন হয়েছে। এই দুই মহান গাউসুল আযমের প্রতি আমরা বিন্মু শ্রদ্ধা জানাই। আমরা সংঘাত বিশ্বুক্ত পৃথিবীবাসীকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের স্বার্থে এ দুই মহান আধ্যাত্মিক পথ নির্দেশকের নির্দেশনা অনুসরণের আহ্বান জানাই।

১.

আলোকধারা প্রকাশ সময়ে জমাদিউল আউয়াল মাস অতিবাহিত হচ্ছে। এ মাসে ‘আহলে বাইত’ সম্পর্কিত ঘোষণা প্রকাশ পায়। আহলে বাইতের অন্যতম সদস্য হলেন মদীনা সাধারণতন্ত্রের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ)। পবিত্র কাবা গৃহে হযরত আলীর (রাঃ) জন্ম। পৃথিবীর কোন মানব সন্তান কাবা গৃহে এর পূর্বে ভূমিষ্ঠ হননি। জন্ম স্থানের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান দান করে আল্লাহু রাবুল ইজ্জত হযরত আলীকে (রাঃ) সৃষ্টি জগতে বিশেষ বিশেষত্ব প্রদান করেছেন। ভূমিষ্ঠ হবার পর হযরত আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম মহানবী (দঃ) এর পবিত্র চাক্ষুস দর্শনের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হন। হযরত আলী (রাঃ) মাতৃদুষ্ফ পানের পূর্বে মহানবী (দঃ) এর পবিত্র জিহ্বা চুষণ করে পৃথিবীর বুকে প্রথম সুপেয় তৃষ্ণি অনুভব করেন। উপর্যুক্ত দুটি ঘটনা হযরত আলীকে (রাঃ) পৃথিবীবাসীর নিকট বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ আসনে সমাদৃত করেছে। শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য, যৌবন সর্বাবস্থায় হযরত আলীর (রাঃ) সময় অতিবাহিত হয়েছে মহানবীর (দঃ) পবিত্র সান্নিধ্যে। তাই তিনি মহানবীকে (দঃ) অনুশীলন এবং অনুকরণ করেছেন একান্তভাবে পরম নিষ্ঠাসহকারে। তাঁর শুদ্ধিতা, শৃঙ্খিতা এবং পবিত্রতার পুরুষার স্বরূপ হিজরত সময়ে জীবন ঝুঁকি নিয়ে তিনি মহানবীর (দঃ) পবিত্র বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ার অধিকারপ্রাপ্ত হন। মূলতঃ এ রাতেই মহানবী (দঃ) নবুয়ত পরবর্তী বেলায়ত ধারার কর্তৃত প্রদানের বিষয়টি হযরত আলীর (রাঃ) জন্ম নির্ধারণ করে দেন। বিদায় হজ্জের পর ‘গাদীরে খুমে’ ভাষণ প্রদান করে মহানবী (দঃ) হযরত আলীর (রাঃ) জন্ম বরাদ্দকৃত এবং নির্ধারিত বেলায়তের সর্দার বিষয়টি জনসমূহে প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ এ ঘোষণায় মহানবী (দঃ) নবুয়ত এবং বেলায়তের উৎস যে অভিন্ন সন্তা থেকে জনগণের হেদায়তের জন্ম মহান আল্লাহর ইহসানভূক্ত-তা ব্যক্ত করেন। মহানবীর (দঃ) পর নবুয়তের সমাপ্তি ঘটে এবং বেলায়তের ধারা ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। বেলায়তের ধারার আমীর হলেন হযরত আলী (রাঃ)। আলোকধারা তাসাওউফ পছীদের গবেষণামূলক পত্রিকা। তাই আমরা আলোকধারার পক্ষ থেকে বেলায়তের মহান সম্মাট মাওলা আলীর (রাঃ) প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম জানাই।

২. ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের জাতীয় দিবস ‘রাষ্ট্র ভাষা দিবস’ উদ্যাপিত হয় ২১ ফেব্রুয়ারি। বর্তমানে এটি জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা’ দিবস। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে ‘বাংলা’ ভাষার স্বীকৃতি

আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে। বিভিন্নভাবে দাবি আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত থাকাকালে ‘কখনো আলোচনা’ ‘কখনো আন্দোলন’ এ ধরনের প্রক্রিয়ায় ১৯৫২ সালের একুশ ফেব্রুয়ারি বাংলা রাষ্ট্রভাষা পূর্ব বাংলার জনগণের সর্বজনীন আন্দোলন হিসেবে ঢাকার রাজপথে গণ বিশ্বের ঘটে। মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্র ভাষা মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে সেদিন বরকত, জবাব, রফিক, শহীদ, শফিউরের রক্ত পূর্ব দিগন্তে লাল সূর্যের উদয় ঘটায়। এ রক্তের শোণিত ধারায় বাংলা ভাষা তদনীন্তন পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে যেমন প্রতিষ্ঠা পায়, তেমনি এ রক্তের উর্মি মাতাল অবস্থান বিশ বছরের মধ্যে সৃষ্টি করে ‘পূর্ব দিগন্ত-সূর্য ওঠেছে, রক্ত লাল রক্ত লাল’ কঠ ধ্বনির উদ্বীপনা। এ রক্ত দ্রোতের দরিয়ায় ১৯৭১ সালে গঠিত হয় আমাদের ভূখণ্ড নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ‘বাংলাদেশ’।

এ কথা প্রাসঙ্গিক যে পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সফল সমাপ্তির পর এ ভূখণ্ডে বাংলা ভাষার ভিত্তিতে নতুন ধারায় সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত ঘটে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর বাংলা ভাষায় সাহিত্য-কাব্য চর্চার মূলকেন্দ্র হিসেবে বিশ্ব দরবারে এ ভূখণ্ডে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। এখন এটি গৌরবের সঙ্গে বলা যায় যে বাংলাদেশ শুধু স্বাধীন রাষ্ট্র নয় বাংলা ভাষা ভিত্তিক রাষ্ট্র হিসেবেও এটি স্বীকৃত। বাংলার সাহসী সন্তানেরা ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়ে মাতৃভাষার সমানজনক স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হওয়ায় আজ আমাদের সৃষ্টি একুশে ফেব্রুয়ারি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘের মাধ্যমে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা’ দিবস হিসেবে উদ্যাপিত হচ্ছে। পৃথিবীর মানুষ এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করতে গিয়ে আবশ্যিক প্রেক্ষাপট হিসেবে বাংলাদেশের নাম এবং বাংলা ভাষার কথা উল্লেখ করে থাকেন। এটি জাতি হিসেবে আমাদের জন্য গৌরবজনক অর্জন।

বাংলা রাষ্ট্র ভাষা হওয়ায় বাংলাদেশে বাংলা ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য চর্চার বিকাশ ঘটেছে খুব বেশি। এ ধরনের বিকশিত ধারার প্রাপ্তি হিসেবে ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে বাংলা ভাষায় অনুদিত গ্রন্থ এবং রচিত পুস্তকরাজির সঙ্গে পরিচিত হতে সক্ষম হচ্ছি। পার্থিব শিক্ষা দীক্ষা লাভের সঙ্গে মাতৃভাষায় নিজের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হবার অবারিত সুযোগ ২১ শে ফেব্রুয়ারির কারণে সহজতর হয়েছে। নিজেদের চর্চিত ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষ মাতৃভাষায় যতো সহজে জানতে সক্ষম হচ্ছে অন্য ভাষায় তা কখনো অতো সহজ নয়। এ কারণে একুশে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে আমাদের ধারণা হচ্ছে, ‘মাতৃভাষা বাংলা ভাষা খোদার সেরা দান, এ ভাষাতেই দিবা নিশি শুনতে পাই খোদার আহ্বান।’ মহান আল্লাহ একুশের অমর শহীদদের বেহেশ্ত নসীব করুন। আমিন!

তাত্ক্ষণ্য কুরআন

সূরা আল-বাকুরা শরীফ (পর্ব-৮)

• অধ্যক্ষ আলহাজ্র মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী •

[বিশিষ্ট লিখক ও গবেষক অধ্যক্ষ আলহাজ্র মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী
কর্তৃক প্রণীত তাফসীর-এ-সূরা ফাতিহা শরীফ মাসিক আলোকধারায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত
হয়েছে। বর্তমানে পর্বে পর্বে ক্রমশঃ সূরা আল বাকুরা শরীফের তাফসীর প্রকাশ করা হচ্ছে।]

আলহাম্মদু ওয়াস্সানাউ ওয়াশ্শুক্রু লিল্লাহিল্লাজী
নাওয়ারানা বিনুরিল ঈমান, ওয়া আফ্দালুস্সালাতু ওয়া
আয্কাসুসালামু ওয়া আহ্সানুত্তাহইয়াতু আলা মান খাস্সাহ
বিল কুরআন, আল্লাজী লাইছা লাহু নজীরুন ওয়া লা
মিচালুন ওয়া লা চান। ওয়া আলা আলিহী ওয়া আহলি
বাইতিহী ওয়া আস্থাবিহিল্লাজীনা কামু বিল ফুরক্তান, ওয়া
আলা আত্বায়ল্লাজীনা তাবিযুক্ত বিল ইহসান, বিল খসুসি
আলা গাউসুল আয়ম আশুশাহ আস্সুফী আস্সৈয়দ
আহমদ উল্লাহ আল্মাইজভাণ্ডারী ওয়া গাউসুল আয়ম বিল
বিরাসত বাবাভাণ্ডারী আশুশাহ আস্সুফী আস্সৈয়দ
গোলামুর রহমান, ওয়া আলা আওলাদিহীমা ওয়া আহলি
তুরীকুত্তিহীমাল্লাজীনা সাবাকুনা বিল ঈমান। আস্মাবাদ.....

পূর্ব প্রকাশের পর

রমাদ্বান মাস সংক্রান্ত মাস্তালা: সূরা বাকারার ১৮৫ নং
আয়াতাংশে পবিত্র বাকে উল্লেখ রয়েছে “ফামান শাহিদা
মিনকুমুশ শাহরা ফাল ইয়াসুমহ” অর্থাৎ: “কাজেই তোমাদের
মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, (অর্থাৎ রমাদ্বান মাস) সে এ
মাসের রোজা রাখবে।”

মাস্তালা: এ মাসটি পাওয়ার মর্মার্থ হলো (১) রমজান মাসে
উপস্থিত বা বর্তমান থাকা, (২) এ মাসটিকে এমতাবস্থায়
পাওয়া, যাতে রোজা রাখার সামর্থ্য থাকে। আর সামর্থ্য বলতে
বুঝায়- (ক) মুসলমান হওয়া, (খ) বুদ্ধিমান হওয়া, (গ)
সাবালক হওয়া, (ঘ) মুকীম হওয়া, (ঙ) মহিলাদের হায়েজ-
নিফায় থেকে পবিত্র অবস্থায় রমজান মাসে বর্তমান বা
বিদ্যমান থাকা।

রোজার ইফতারের সময় দোয়া করুল: ১৮৬ নং আয়াতাংশের
পবিত্র বাকে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আমি আমার
বান্দাদের সন্নিকটে রয়েছি, যখনই তারা আমার কাছে কোন
বিষয় প্রার্থনা বা দোয়া করে, আমি তাদের সে দোয়া করুল
করে নেই এবং তাদের বাসনা পূরণ করে দেই। এমতাবস্থায়
আমার হৃকুম আহকাম মেনে চলা বান্দাদেরও একান্ত কর্তব্য।
তাতে কিছুটা কষ্ট হলেও তা' সহ্য করা উচিত। ইমাম ইবনে
কাসীর দোয়ার প্রতি উৎসাহ দান সংক্রান্ত এই মধ্যবর্তী

বাক্যটির তৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতের
দ্বারা রোজা রাখার পর দোয়া করুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা
হয়েছে। সে জন্যই রোজার ইফতারের পূর্বাপর দোয়ার
ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা উচিত। রাসূলে পাক
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ইরশাদ করেছেন-
“লিস্বস্বায়িমে ইনদা ফিতরিহী দাওয়াতুন মুস্তাযাবাতুন”
অর্থাৎ- রোজার ইফতার করার সময় রোজাদারের দোয়া
করুল হয়ে থাকে (সূত্র- আবু দাউদ শরীফ)। সে জন্যই
হ্যারত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
ইফতারের সময় বাড়ীতে সবাইকে সমবেত করে দোয়া-
মুনাজাত করতেন।

মাস্তালা: কোন ব্যক্তি যদি ঘুম ভাঙ্গার পর শুনতে পায় যে,
ফজরের আজান হচ্ছে, তখন তার পক্ষে সুবহে-সাদিক উদয়
হওয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহে একীন হয়ে যায়। এরপরও যদি
সে জেনে শুনে কিছু খেয়ে নেয়, তবে সে গুনাহগারও হবে
এবং তার উপর সে রোজা কায়া করাও ওয়াজিব হবে। অপর
পক্ষে যদি সে সন্দেহ যুক্ত সময়ে খায় এবং পরে সুবহে-
সাদিক এ সময়েই উদিত হয়েছিল বলে জানতে পারে, তবে
তার উপর থেকে গুনাহ রহিত হয়ে যাবে বটে, কিন্তু রোজার
কায়া করতে হবে।

মওদুদীর ভাস্ত মাস্তালা: জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা
মাওলানা মওদুদী তার রচিত তফহীমুল কুরআন ১ম খন্ড, ১৬
পৃষ্ঠায় লিখেছেন- সাহরীর জন্য এমন কোন শেষ সীমা নির্দিষ্ট
নাই, যার কয়েক সেকেন্ড বা কয়েক মিনিট এদিক ওদিক হলে
রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। রোজাদারের জন্য সুবহে সাদেকের
পর ‘আজান শুনলেও’ পানাহার করা বিলকুল জায়েয
(নাউজুবিল্লাহ)। অথচ তিরমিজী শরীফ ১২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত
হাদীছের ভাষ্যে রয়েছে যে, সাহরীর শেষ সীমা সুবহে সাদিক
হওয়ার পর পানাহার করলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।

সাহাবা-ই-কিরামের প্রশ্ন প্রসঙ্গে: ১৮৯ নং আয়াতে নতুন
চন্দ্রের বিষয়ে রাসূলে পাকের নিকট সাহাবাদের প্রশ্নের কথা
উল্লেখ রয়েছে, প্রসংগত উল্লেখ্য যে, মুফাস্সিরকুল শিরোমনি
হ্যারত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্রাহাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু
বলেন, সাহাবা-ই-কিরামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে,

তাঁরা রাস্তাহাত সালাহাহ আলাইহি ওয়াসালাম এর প্রতি সম্মত ও সমীহ বোধের কারণে খুব কমই প্রশ্ন করতেন। তাঁরা এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যমানার উম্মতদের ব্যতিক্রম ছিলেন। পূর্ববর্তী উম্মতগণ এ আদবের প্রতি সচেতন ছিলনা। তারা সব সময় তাদের নবীদেরকে নানা অবাস্তর প্রশ্ন করতো। হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্হ বলেন, সাহাবীগণের যে সব প্রশ্নের উল্লেখ কুরআন মজীদে বিদ্যমান রয়েছে; তা সংখ্যায় মাত্র ১৪টি। এ চৌদ্দটি প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন ‘ওয়া ইজা সাআলাকা ইবাদী আল্লী’ অর্থাৎ- ‘যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে আপনার কাছে প্রশ্ন করে’ বক্ষস্থ দ্বিতীয় প্রশ্নটি চন্দ্রের হাস-বৃক্ষি সম্পর্কিত। এতদভিন্ন সূরা বাক্সারায় আরো ছয়টি প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে। বাকী ছয়টি প্রশ্ন পরবর্তী বিভিন্ন সূরায় বিদ্যমান আছে।

ইহসান সংক্রান্ত নির্দেশনা: ১৯৫ নং আয়াতাংশের ‘ওয়া আহছিনু ইন্নাল্লাহ ইউহিবুল মুহছিনীন’ অর্থাৎ- ‘আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর, আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন’ অত্র বাক্যে প্রত্যেক কাজই সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে। সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করাকে কুরআন ‘ইহসান’ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছে। ইহসান দু’ রকম : (১) ইবাদতের ইহসান ও (২) দৈনন্দিন কাজ কর্ম, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহসান। ইবাদতের ইহসান সম্পর্কে স্বয়ং রাস্তাহাত সালাহাহ আলাইহি ওয়াসালাম ‘হাদিস-ই-জিবরাইল’ এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এমনভাবে ইবাদত কর, যেন তুমি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখছ। আর যদি সে পর্যায় পর্যন্ত পৌছতে না পার, তবে এ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, স্বয়ং আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।

এছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যপারে (মু’আমালাত ও মু’আশারাতে) ইহসানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হ্যরত মা’আয় ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্হ বর্ণিত মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে হ্যরত রাসূলে করীম সালাহাহ আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেনঃ তোমরা নিজেদের জন্যে যা কিছু পছন্দ কর অন্যান্য লোকদের জন্যেও তাই পছন্দ কর। আর যা তোমরা নিজেদের জন্যে অপছন্দ কর, অন্যের জন্যেও তা অপছন্দ করবে- (সূত্র- মাযহারী)

ওমরাহুর বিধান: ১৯৬ নং আয়াতের ভাষ্যে বলা হয়েছে- ‘আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহু পরিপূর্ণভাবে পালন কর।’ সূরা আলে ইমরানের একটি আয়াতের মাধ্যমে হিজরী তৃতীয় সনে হজ্জ ফরজ করা হয়েছে, সেখানে ওমরাহুর কথা আলোচনা হয়নি; তাই অত্র আয়াতে তার উল্লেখ রয়েছে। ইবনে কাসীর হ্যরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আন্হর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেনঃ তিনি রাসূল

সালাহাহ আলাইহি ওয়াসালামকে জিজেস করেছিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওমরাহু কি ওয়াজিব? তিনি বলেছিলেনঃ ওয়াজিব নয়, তবে যদি কর, খুবই ভাল। তিরমিয়ী রহমাতুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহি বলেছেন- এ হাদিসটি সহীহ ও হাসান বা বিশুদ্ধ সূত্রক্রম যুক্ত। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক রাহিমাল্লাহু প্রযুক্ত ওমরাহুকে ওয়াজিব বলেননি, সুন্নাত বলে গণ্য করেছেন।

মাসৃআলা: হজ্জ অথবা ওমরাহু শুরু করলে তা আদায় করা ওয়াজিব। ওমরাহুর জন্যে কোন নির্ধারিত সময় নেই। বছরের যে কোন সময় তা আদায় করা যায়। তবে হজ্জের মাস ও এর অনুষ্ঠানাদি আদায়ের জন্যে নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারিত রয়েছে।

মীকাত এর সংজ্ঞা: এই সমস্ত নির্ধারিত স্থান সমূহকে মীকাত বলা হয়, যা সারা বিশ্বের হজ্জ যাত্রীগণ যিনি যে দিক থেকে আগমন করেন, সে সব রাস্তার প্রত্যেকটিতে একটি চিহ্নিত স্থান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। যখনই মকায় আগমনকারীরা এ স্থানে আসবে, তখন হজ্জ অথবা ওমরাহুর নিয়তে ইহরাম করা আবশ্যক। ইহরাম ব্যতীত নির্ধারিত এ স্থান অতিক্রম করা গোনাহের কাজ।

হজ্জ-ওমরাহু একত্রে আদায় প্রসঙ্গে: যাদের পরিবার-পরিজন মীকাতের সীমারেখার অভ্যন্তরে বসবাস করে না, তাদের জন্যে হজ্জ ও ওমরাহু হজ্জের মাসে একত্রে করা জায়েয়। পক্ষান্তরে মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্যে আওয়াল মাস এসে গেলে তখন হজ্জ ও ওমরাহু একত্রে সমাধা করা নিষেধ। কেননা তাদের পক্ষে হজ্জের মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ওমরাহুর জন্যে দ্বিতীয় বার মিকাতস্থলে গমন করা তেমন অসুবিধার ব্যাপার নয়। কিন্তু এ সীমারেখার বাইরে থেকে যারা হজ্জ করতে আসে, তাদের জন্যে দুটিকেই একত্রে আদায় করা জায়েয় করে দেয়া হয়েছে; এ কারণে যে, এত দূর দূরান্ত থেকে ওমরাহুর জন্যে পৃথকভাবে ভ্রমণ করা খুবই কঠিন ও অসুবিধাজনক।

তামাত্রু’ ও ক্লিরাণ: হজ্জের মাসে ওমরাহুকে একত্রিকরণের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে, মীকাত হতে হজ্জ ও ওমরাহুর জন্যে একত্রে ইহরাম করা। শরীয়তের পরিভাষায় একে ‘হজ্জে ক্লিরাণ’ বলা হয়। এর ইহরাম হজ্জের ইহরামের সাথেই ছাড়তে হয়, হজ্জের শেষ দিন পর্যন্ত তাকে ইহরাম অবস্থায় কাটাতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, মীকাত হতে শুধু ওমরাহুর ইহরাম করবে। মক্কা আগমনের পর ওমরাহুর কাজ-কর্ম শেষ করে ইহরাম খুলবে এবং ৮ই ফিলহজ্জ তারিখে মিনা যাবার প্রাক্কালে হেরাম শরীফের মধ্যেই ইহরাম বেঁধে নেবে। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় ‘তামাত্রু’। (চলবে)

গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের জন্মভূমির পরিচয়

• জহুর-উল-আলম •

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের জন্মভূমি এবং আবির্ভাব স্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা প্রদান করেছেন গুণ্ডজ্ঞান রাজির সম্মাট শায়খুল আকবর হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (রহঃ)। ভৌগোলিক অবস্থানের যে বর্ণনা তিনি ‘ফুসুসুল-হেকম’ কিতাবে প্রদান করেছেন সে হিসেবে চট্টগ্রাম হচ্ছে ‘খাতেমুল অলদ’ গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের জন্ম এবং আবির্ভাব স্থান। ফুসুসুল-হেকম কিতাবে তিনি খাতেমুল অলদ এর পবিত্র নাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেছেন। শায়খুল আকবরের মতে খাতেমুল অলদের নাম মহান স্বষ্টির ইস্মে জাত ‘আল্লাহ’ এবং মহানবী (দঃ) এর বেলায়তী নাম ‘আহমদ’ এর সংযুক্তিতে রাখা হবে। গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী ভূমিষ্ঠ হ্বার পর তাঁর পিতা হ্যরত সৈয়দ মতিউল্লাহ (রহঃ) পুত্রের নাম মহানবীর (দঃ) স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী রাখেন সৈয়দ আহমদ উল্লাহ। ফুসুসুল-হেকমের বর্ণনা অনুযায়ী ‘খাতেমুল অলদ’ হচ্ছেন ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র ‘তাওহীদ’ এর শেষ ইটের গাঁথুনি। এরপর ধর্ম-বর্ণ-জাতি-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষকে তাওহীদ তথা একত্বাদের পতাকাতলে সমবেত হ্বার লক্ষ্যে উন্মুক্ত ঐশ্বী প্রেমবাদের ভিত্তিতে ঐক্যবন্ধ হ্বার আহ্বান জানানো হবে। গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের জীবন পঞ্জীতে উপর্যুক্ত কর্মধারা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। হ্যরত ইবনুল আরাবী (রহঃ) ফুসুসুল-হেকম কিতাবে উল্লেখ করেছেন খাতেমুল অলদ ঐ সময় থেকে আউলিয়া, যে সময় হ্যরত আদম (আঃ) পানি ও মাটির সঙ্গে সংমিশ্রিত ছিলেন। উক্ত কিতাবে আরো উল্লেখ আছে “খাতেমুল আউলিয়া রাসূলুল্লাহ (দঃ) -এর অলিয়ে ওয়ারেস হন। তিনি রাসূলুল্লাহর (দঃ) বিভিন্ন রূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রূপ।” খাতেমুল অলদ সর্ববেষ্টনকারী বেলায়তের অধিকারী। তিনি বেলায়তে খিজরী’র অধিকারী হিসেবে উর্ধ্বতন মহামান্যগণ থেকে অনন্য অবশিষ্টজন তথা ‘ফরদুল আফরাদ’ হ্বেন। তিনি পূর্ববর্তী আদীয়ানে সাবেকা তথা অতীতকালের সকল ধর্মাদি এবং বিভিন্ন মুখী বিক্ষিপ্ত তুরিকতপন্থা অর্থাৎ বিভিন্ন মত এবং পথের সমাবেশকারী হিসেবে ‘জামে উত্তনজিহ ওয়াক্তশবীহ’ হ্বেন। উপর্যুক্ত তথ্যসমূহ মূলতঃ ফুসুসুল-হেকম কিতাবের ব্যক্ত বিষয়। তাই ফুসুসুল-হেকম এবং এ কিতাবের লেখক

সম্পর্কে বর্ণনা উপস্থাপন করা জরুরী।

হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (রহঃ)

শায়খুল আকবর হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর জন্ম ৫৬০ হিজরী সনে ১১৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের মুরসিয়া নামক স্থানে। তাঁর জন্মের এক বৎসর পর ৫৬১ হিজরী সনে অলিকুল সম্মাট গাউসুল আয়ম শাহসুফি মাওলানা সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (কঃ) বড় পীর সাহেব কেবলা ওফাতপ্রাণ্ত হন। বিভিন্নভাবে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর পুণ্যবান পিতা আলী ইবনে আহমদ ছিলেন পৃথিবীখ্যাত দানবীর ‘দাতা হাতেম তাঙ্গ’ এর উত্তর পুরুষ। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় হতাশ হয়ে ৫৫৯ হিজরী তথা ১১৬৪ খ্রিস্টাব্দে বিশেষ দয়ার আশা নিয়ে গাউসুল আয়ম বড়পীর সাহেব কেবলার দরবারে উপস্থিত হন। জীবনের অন্তিম সময়েও কোন সন্তান না পাওয়ার বেদনা তিনি হ্যরত বড়পীর সাহেব কেবলাকে মিনতিসহকারে অবহিত করেন। এ সময় আকৃতি রক্ষার্থে বড়পীর সাহেব কেবলা নিজের পবিত্র পৃষ্ঠের সঙ্গে ইবনুল আরাবীর পিতার পৃষ্ঠদেশ লাগিয়ে বসতে হ্রকুম দেন। নির্দেশ অনুযায়ী ইবনুল আরাবীর পিতা পৃষ্ঠ লাগিয়ে বসলে বড়পীর সাহেব কেবলা পৃষ্ঠ-পৃষ্ঠে ঘষা দেন। এরপর বিশ্ব বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক, দার্শনিক মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মূল নাম মুহাম্মদ ইবনে আলী-ইবনে আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ। সর্ব সাধারণ্যে তিনি ‘ইবনুল আরাবী’ নামে পরিচিত এবং প্রসিদ্ধ।

ইবনুল আরাবী (রহঃ) স্পেনের আশবেলার প্রসিদ্ধ মাদ্রাসায় হাদিস শরিফ এবং ফিকাহ শাস্ত্রে শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন অতুলনীয় মেধা, শাশ্বত বুদ্ধি ও ধী শক্তির অধিকারী। পবিত্র কুরআন, যুক্তি বিদ্যা, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অসাধারণ ধারণা, শাশ্বত বুদ্ধি এবং ধী শক্তির অধিকারী হ্বার কারণে তাঁর খ্যাতি অতি দ্রুত পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণী মহলে ছড়িয়ে পড়ে। পাণ্ডিত্য-জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার কারণে তাঁর অনুসারী-অনুগামীরা তাঁকে ‘শায়খুল আকবর’ বা ‘জ্ঞানীকুল শিরোমণি’ উপাধিতে সম্মোধন করেন। স্পেনে জন্মগ্রহণ করলেও আফ্রিকা ও প্রাচ্যের বহু দেশ ভ্রমণ করে তিনি সাত বৎসর পবিত্র মুক্তা নগরীতে বসবাস করেন। সেখান থেকে স্থায়ীভাবে দামেক্ষে চলে আসেন এবং ৬৩৮ হিজরীর ১২৪৩

খিস্টাদে দামেক্ষে ইত্তিকাল করেন। সেখানে তাঁর মাজার রয়েছে।

আশৈশব মধুর স্বভাব ও অনুপম চরিত্রের হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী ছিলেন প্রথম স্মৃতি শক্তির অধিকারী। জ্ঞান আহরণে অকস্তানীয় অদম্য স্পৃহার কারণে তিনি পরিচিত মহলে ঈর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন। একজন আধ্যাত্মিক সাধক এবং আল্লাহর প্রেমে মর্মভেদী আর্তনাদে ‘মস্ত’ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর লেখনি প্রতিভা এবং বিশ্লেষণ ধারা ছিল অত্যন্ত সুশ্রেষ্ঠ ও বিন্যস্ত। ইবনুল আরাবী গদ্য ও পদ্য উভয়বিধি রচনাতে ছিলেন সমান পারদর্শী। তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৯০টি। কারো কারো মতে তিনি ৫০০ গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে (১) ফুসুসুল-হেকম, (২) আল ফতুহাত আল মক্কীয়া, (৩) যাখারেয়ুল আখ্লাক প্রভৃতি।

ফুসুসুল-হেকম

কিতাবটি তাসাওউফ সংক্রান্ত। এ গ্রন্থে মহান আল্লাহ প্রেরিত নবী রাসূলদের নাম শীর্ষক সাত শতটি অধ্যায় রয়েছে। গ্রন্থটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কিত বিশাল মনি মুক্তির ভাণ্ডার। তাসাওউফ শাস্ত্রের অনেক জটিল বিষয় এ গ্রন্থে আলোচনা হয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি ‘খাতেমুল অলদ’ সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী করেছেন। এ গ্রন্থের মূল্যমান এতো বেশি যে বইটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং সর্বত্র জ্ঞানী-গুণী ও সুধীবৃন্দ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। গ্রন্থটিকে স্রষ্টা সম্পর্কিত জ্ঞানের অনুপম নির্দেশিকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ফুসুসুল-হেকম কিতাব রচনার বর্ণনা দিতে গিয়ে ‘মাশাহীরে ইসলাম’ কিতাবের প্রথম খণ্ডে হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর বর্ণনায় উল্লেখ করা হয় “৬২৭ হিজরী সনের মুহর্রম মাসের শেষ দশকে আমি দামেক্ষে অবস্থান করেছিলাম। স্বপ্নযোগে হজুর নবী করিম (দঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করলাম। দেখলাম তাঁর পবিত্র হাতে একটি কিতাব রয়েছে। আমাকে লক্ষ্য করে মহানবী (দঃ) ইরশাদ করেছেন—“এই কিতাবখানার নাম ‘ফুসুসুল-হেকম’। এটি নাও এবং প্রচার করে দাও, যাতে লোকজন উপকৃত হতে পারে।” স্বপ্নযোগে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েই শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আমি এ কিতাব লিখেছি। রাসূলে মকবুল (দঃ) কিতাবের যে রূপ রেখা আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন, আমি শুধুমাত্র সেটিই রূপায়িত করেছি।” শায়খুল আকবরের উপর্যুক্ত মন্তব্যের আলোকে ‘ফুসুসুল-হেকমের’ উৎস সম্পর্কিত আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। আল ফতুহাত আল মক্কীয়া গ্রন্থে তিনি রিসালত, ওহি,

আল্লাহ, মানব সৃষ্টি রহস্য, রোজ কিয়ামত, পাপ-পূণ্য, শাস্তি-পুরক্ষার, পবিত্র কুরআনের নিত্যতা, লওহে মাহফুজ, হ্যরত আদমের (আঃ) জন্ম ইত্যাদি গভীর তত্ত্ব কথার বিস্তারিত বিবরণের পাশাপাশি বিভিন্ন মাযহাব ও ত্বরিকা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করেছেন।

যাখায়েরুল আখ্লাক কিতাবটি হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর (রহঃ) কবিতা সমূহের বিখ্যাত সংকলন। এ গ্রন্থে তিনি ইশ্কে ইলাহীর হাল বর্ণনা করেছেন। প্রচণ্ড আবেগ এবং অন্তর্জ্ঞালার বিশ্বেরণ ঘটিয়েছেন আশেক-মাশেকের রহস্যময় সম্পর্কের অনন্ততায়। এ গ্রন্থে তিনি; “যা মহান আল্লাহ বিশেষ রহমতে তাঁর অন্তরে উদিত করেছেন এবং আল্লাহর তরফ হতে তাঁর পবিত্র রংহের প্রতি যে সকল এলহাম এসেছে তা রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন। কবিতাসমূহে নিজের মনে সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর ইশ্কে জ্বলে থাকা সলিতার প্রকাশ ঘটলেও তা রূপক অর্থে প্রকাশ করেছেন। তিনি অত্যন্ত সুনিপুণ কায়দায় মনের অবস্থা গোপন রেখে ঐশ্বী প্রেমের শর্ত ‘প্রচণ্ড গোপনীয়তা’ সংরক্ষণ করেছেন। মহান আল্লাহর গৃঢ় রহস্য অভেদ রাখায় তাঁকে অনেকে নান্দনিক ভাষায় ‘কৃপণ’ অভিধা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন জাগতিক চোখে আল্লাহ দেখা অসম্ভব। আল্লাহর চোখে মহান আল্লাহকে দেখা রহমানুর রহিমের বিশেষ অনুগ্রহীতদের জন্য শর্ত এবং বরকত। উল্লেখ্য যে পৃথিবীর বিস্ময়কর প্রতিভাধর জ্ঞানী লেখকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (রহঃ) অনন্য একজন। প্রতিটি গ্রন্থে তিনি অনুপম বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই তাঁকে নিয়ে প্রাচ্যপাশ্চাত্যে এখনো চলছে গবেষণা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। তাঁর প্রতিটি লেখায় রয়েছে স্রষ্টা-সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণার প্রচণ্ড-উদ্দীপনা।

হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর (রহঃ) আধ্যাত্মিক দর্শন সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রথ্যাত গবেষক বিচারপতি আবদুল মওদুদ তাঁর মুসলিম মনীষী গ্রন্থে উল্লেখ করেন, “তাঁর (ইবনুল আরাবী) বিশ্বাস, যে মানব তত্ত্বে ঐশ্বী মাত্রার বিকাশ ও স্ফুরণ ঘটে, সে বিশ্বাসে আদম (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহর প্রথম শারীরিক বিকাশ। অবশ্যে মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর মধ্যেই তিনি মানবতার পূর্ণাঙ্গ রূপ বা ইনসানে কামিল এর প্রকাশ দেখেছেন। তাঁর [মহানবী (দঃ)] মাধ্যমেই আল্লাহ সৃষ্টি জগতের প্রতি তাঁর অনন্ত কর্ণণাধারা বর্ণণ করেছেন। যার ফলে সৃষ্টিলোক অনন্তকাল ধরে প্রাণবন্ত ও বিকশিত হচ্ছে। মানবীয় দেহের ঐশ্বী সত্ত্বায় পূর্ণতা প্রকাশই আল্লাহর এক চিরস্তন রহস্য। মানুষের মাঝে

সৃষ্টির নিজেরই মধুরতম বিকাশের কারণেই সৃষ্টিলোক সম্ভব হয়েছে।” আরাবীর পূর্বে সুফি মতবাদ শুধুমাত্র কৃচ্ছ সাধনা হিসেবে বিবেচিত হতো। হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (রহঃ) সুফি সাধনাকে চিন্তা এবং দার্শনিক চেতনায় সমর্থিত করেন। তিনি প্রেমতত্ত্ব, ফানা-বকা, আত্মা প্রভৃতি নিয়ে সুস্থ আলোচনা করেছেন এবং তাঁর অধ্যাত্ম দর্শনের মূল সুর ছিল সর্বখোদাবাদ বা ‘ওয়াহদাতুল ওজুদ’।

মহান আল্লাহকে জানার উপায় হিসেবে হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (রহঃ) তিনটি গুণের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে যে যতো বেশি ঐশ্বী গুণ ব্যক্ত করবে বা করতে পারবে, সে বস্তু ততো বেশি পূর্ণতার অধিকারী হবে। উল্লেখ্য যে, সৃষ্টিকূলের মধ্যে ঐশ্বীগুণ সর্বোত্তমাবে দেখা যায় মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর মধ্যে। প্রজ্ঞার সৃষ্টিকূলের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই ‘ইন্সানে কামিল’। সৃষ্টিকূলের মধ্যে তিনি ‘খাইরে খালকি’ অর্থাৎ সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর গুণরাজি অসীম, তাঁর মহিমা অতুলনীয়। মহান আল্লাহর সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছে হ্যরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর মধ্যে। তাঁর উর্ধ্বে ‘ইলাহ’ এর অস্তিত্ব ব্যতীত আর কিছু নেই।

হ্যরত শায়খুল আকবরের মতে, “বান্দা যখন আল্লাহর রহমত, মারিফাত প্রত্যাশী হয়ে মুরাকাবাহর মাধ্যমে মহান প্রভুর জিকিরে মগ্ন হয়, তখন ‘কুলব’ অন্যসব জাগতিক চিন্তামুক্ত হয়, বান্দা নিঃস্ব অবস্থায় ফকিরের মতো প্রভুর দরজায় লুটে পড়ে। তখন আল্লাহতা’লা বান্দার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে অনুগ্রহ দ্বারা তাকে সিঙ্গ করেন, প্রভুর নিগৃত তত্ত্ব রহস্য ‘মারিফাত’ দানে ধন্য করেন, তাঁকে ইলমে লদুনী দান করেন, তাতে বান্দার অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়, তাঁর কশফ অর্জিত হয়।” অর্থাৎ সর্বপ্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাপ্তি বাসনা-কামনা মুক্ত মন ব্যতীত মারিফাত জগতে প্রবেশ সম্ভব নয়।

ইবনুল আরাবী উপর্যুক্ত মানসিক অবস্থান তৈরির নিমিত্তে মন্দ লোকের সমাবেশ থেকে বেঁচে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে সঙ্গদোষে মানুষ চরিত্র হারিয়ে ফেলে। ইবনুল আরাবী উল্লেখ করেছেন, “মানুষের খেয়াল বা মনোযোগ তার জীবনের ভালো-মন্দ, উত্থান-পতন এবং সফলতা-ব্যর্থতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। মানুষ সারাক্ষণ ভালো চিন্তা করবে এবং ভালো কাজে মনোনিবেশ করবে-এ উদ্দেশ্য সাধনে মহান আল্লাহ তাঁর তামাম মখলুকাতের মধ্যে একমাত্র মানুষকেই কল্পনা করার এবং স্বপ্ন দেখার শক্তি দিয়েছেন। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উত্তম নেয়ামত এবং আমানত। মানুষের কাছ থেকে এটি ছিনিয়ে নেয়া হলে দুর্ভাগ্য

লোকটি বদ্ধ উন্নাদে পরিণত হয়। কাজেই প্রতিটি সুস্থ মানুষের চিন্তা করা উচিত যে তার খেয়ালের অপার শক্তিটির যেন খেয়াল না হয়। শায়খুল আকবর আরো বলেন, মুমিন তাঁর নিজের নফসের মুসাহিব হিসেবে আল্লাহর পক্ষে হররোজ নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ করে। যার ফলে কিয়ামতের দিন ওইসব মুমিনের জন্য কোনো হিসাব দরকার পরবে না।” ইবনুল আরাবীর উপর্যুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে ঘোষিত ‘সপ্ত পদ্ধতি’র সূত্র এবং মর্মার্থের মিল রয়েছে।

ওয়াহদাতুল ওজুদ এবং ইবনুল আরাবী

হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (রহঃ) সর্বপ্রথম ওয়াহদাতুল ওজুদ তথা ‘আল্লাহর সিংহাসন সর্বত্র’-কুরআনিক ঘোষণাকে ধর্মীয় চেতনা এবং জ্ঞানগত মিশ্রণের ভিত্তিতে দর্শনগত রূপ দেন। তাঁর মতে ‘বিশ্বজগতই আল্লাহ এবং আল্লাহই বিশ্বজগত’। তিনি বিশ্বাস করেন নৈয়ায়িক বিষয়ে স্রষ্টা ও জগতকে দুটি সত্তা হিসেবে ধরে নিলে স্রষ্টা তথা আল্লাহকে জগতের কারণ এবং জগতকে তার ফল বলে স্বীকার করে নিতে হয়। তাঁর মতে স্রষ্টা পরিদৃশ্যমান জগতের কারণ ও কার্য উভয়ের মধ্যে অন্তর্লীন রয়েছেন। ইবনুল আরাবীর মতে, পরম সত্তা বা স্রষ্টা, তথা আল্লাহ অন্তর্বর্তী এবং অতিবর্তী উভয়ই। অর্থাৎ তিনি জগতের ভিতরে-বাইরে সকল পরিসরে বিদ্যমান আছেন। তাঁর মতে, “যে পরম সত্তাকে আমরা দেখতে পাইনা, অনুমান করি মাত্র, তা এক ঐশ্বী সাধারণ গুণ, যাঁর সম্পর্কে অন্য কিছু আরোপ করা যায় না। এ কারণে মহান আল্লাহ ‘সংজ্ঞার অতীত’। অর্থাৎ তাঁকে নিয়ে কেন সংজ্ঞা চলে না। হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর (রহঃ) ‘ওয়াহদাতুল ওজুদ’ ধারণা বিভিন্ন মহল বিশেষত ফকীহদের মাধ্যমে সমালোচিত হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, ফকীহ এবং সুফিদের মধ্যে মতবিরোধ হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্দে শুরু হয়। ফকীহ এবং সুফিদের মধ্যে মতবিরোধ ও বাগড়ার তিক্ত ফল ভোগ করেছিলেন তাপস কুল শিরোমনি হ্যরত হোসাইন মনসুর হাল্লাজ (রহঃ)। ইবনুল আরাবী (রহঃ) সুফি-ফকীহদের মতবিরোধ সম্পর্কে সতর্ক থেকে ওয়াহদাতুল ওজুদ তথা সর্বত্র আল্লাহর একক অস্তিত্ব মাসআলা প্রদান করেন। তিনি হ্যরত হোসাইন মনসুর হাল্লাজ (রহঃ) এবং হ্যরত ওমর ইবনুল ফরিদ (রহঃ) এর মতো ‘আনাল হক’ বা আনা হিয়া উক্তি না করে উক্ত ধারণার দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর দার্শনিক ব্যাখ্যা জটিল বিষয় হওয়ায় অনুসারীদের অনেকে তাঁকে ‘বখিল’ তথা কৃপণ বলেছেন।

অন্যদিকে তাঁর মতের বিরুদ্ধাচারীরা তাঁর কিতাব বিশেষত ‘ফসুসুল-হেকম’ এবং ‘ফতুহাতুল মক্কীয়া’ এর বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। তাঁদের মতে তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইসলামী তালীমাতের বিরোধী। অনেকে তাঁর মতামতকে কুফরী এবং গোমরাহী বলে নিন্দাবাদ করেছেন। তাঁদের প্রতিবাদের কারণে মিশরে তাঁকে বার বার হত্যার চেষ্টা করা হয়। যাঁরা তাঁর তীব্র বিরোধী হিসেবে পরিচিত তাঁরা হলেন (১) ইবনে তাইমিয়া (২) ইবনে খালদুন (৩) ইবনে হাজার আস্ক কালানী এবং (৪) ইব্রাহীম আল বেকাই উল্লেখযোগ্য। ইব্রাহীম বেকাই (কঃ) ‘তানবীছন্নাবী আলা তাক্ফীরে ইব্নে আরাবী এবং (খ) ‘তাহ্যীরুল এবাদ মিন আহলিল এনাদ ওয়া বেদআতিল এন্ডেহাদ’ নামের দুটি কিতাব লিখে ইবনুল আরাবীর বিরুদ্ধে তিরক্ষার ও দোষারোপের সমুদ্র সৃষ্টি করেন। তিনি কিতাব সমূহকে পথভ্রষ্টকারী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

একই সঙ্গে সুফি এবং খ্যাতনামা ওলামা মশায়েখের একটি বড় দল তাঁর মতামতকে সমর্থন দান করে উল্লেখ করেন যে বন্দেগী তথা বান্দা হয়ে আল্লাহর অন্বেষন এবং প্রেমময় মনো-মন্ততায় আল্লাহর অন্বেষনের সূত্রগত সীমারেখা অনুধাবন করা না গেলে ইবনুল আরাবীর ‘ওয়াহ্দাতুল ওজুদ’ মতবাদ কখনো স্পষ্ট হবে না। তাঁর সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন মাজদুন্নীন ফিরোয়াবাদী, কুতুবুন্নীন হামাবী, সালাহুন্নীন সাফ্দী, শেহাবুন্নীন সোহরাওয়ার্দী, ইমাম ফখরুন্নীন রায়ী, জালাল উন্নীন সুযুতীসহ অনেকে। আল্লামা জালাল উন্নীন সুযুতী (রহঃ) ইবনুল আরাবীর বিরোধিতায় লিখা পুস্তকদ্বয়ের প্রতিবাদে “তানবীছন্নাবী ফী তাবরিয়াতে ইবনে আরবী” কিতাব লিখেন। এছাড়া হ্যরত আবদুল গণি নাবলুসী (রহঃ) এবং হ্যরত আবদুর রাজ্জাক আল কাশানী (রহঃ) ইবনুল আরাবীর সমর্থনে একাধিক গ্রন্থ লিখে ইবনুল আরাবীর মতামতকে পূর্ণ সমর্থন দেন। প্রকৃত পক্ষে ‘ওয়াহ্দাতুল ওজুদ’ মতবাদ নতুন কিছু নয়। হাদিসে কুদ্সিতে আল্লাহ বলেন, “আমি গুণ্ঠ ভাগ্ন ছিলাম। নিজেকে জানার জন্যে সৃষ্টিকে প্রকাশ করলাম।” পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ সার্বিক বিষয়ে তাঁর অন্তিত্বের ঘোষণা বার বার দিয়েছেন। “পূর্ব ও পশ্চিম সবকিছুই আল্লাহর। অতঃপর তুমি যে দিকে মুখ ফিরাওনা কেন, সেদিকে আল্লাহ বিরাজমান” (২:১১৫)। “সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং সাম্রাজ্যও তাঁরই।” “নভোমগুল ও ভূমগুল এবং উভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে এ সমস্ত কিছুই আল্লাহর জন্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি প্রতিটি বস্তুর উপর সক্ষমতা রাখেন (৫:১৭)। “তাঁর কুরসী বা

সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে বেষ্টন করে আছে”-(আয়াতাংশ ২: ২৫৫)। ‘ওয়াহ্দাতুল ওজুদ’ সম্পর্কে সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ হ্যরত খাজা মুইনুন্দিন চিশ্তি তাঁর দিওয়ানে উল্লেখ করেছেন, “হে অস্তিত্ব জগতের মালিক গোটা জগত তুচ্ছ, উদ্দেশ্য শুধু তুমি। সকল অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু তুমি, অস্তিত্বান্ব প্রতিটি বস্তু তোমার কারণেই স্থিতি লাভ করেছে। দেহ ও প্রাণের শুরু ও সমাপ্তি জাহের ও বাতেনে রয়েছে তোমার অস্তিত্বের আভিজ্ঞাত্য। তোমার আসল কোথা থেকে, তার থেকেই হেদায়েত পরিসমাপ্তি কোথায়-তার দিকে প্রত্যাবর্তন।” খাজা গরীবে নেওয়াজ এর উক্ত গজল বিশ্লেষণ করলে ‘ওয়াহ্দাতুল ওজুদ’ ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায়। ওয়াহ্দাতুল ওজুদের সর্বপ্রথম প্রকাশ ঘটে সুলতানুল আরেফিন হ্যরত বায়েজিদ বোন্তামী (রহঃ) এর বিখ্যাত উক্তি ‘হামে উসত্’ অর্থাৎ ‘সবই সে’ ব্যক্তের মাধ্যমে। সুলতানুল হিন্দ আরো উল্লেখ করেছেন, “যেহেতু জাত ও সিফাত একে অন্য থেকে পৃথক নয়, যে দিকে তাকাই খোদা ভিন্ন কিছু দেখিন। যেদিকেই আমাকে নিয়ে যাও আলহামদুলিল্লাহ, কারণ নিজেকে তোমার থেকে কোনভাবেই পৃথক দেখিন। মুঁজনের প্রাণের আরোহণ ‘আও আদনার’ সর্বোচ্চ চূড়ায় মোস্তফার অনুসরণ ছাড়া (মুক্তির) কিছুই দেখিন।” ইবনুল আরাবীর পর প্রায় সকল সুফি সাধক নিজের গ্রন্থ ও গজল লিখেছেন। সুফি কবি হ্যরত আমীর খসরু (রহঃ) এর বিখ্যাত “গজল মান্ তো শোদাম তো শোদী-মান্ তো শোদাম তো জ’ন শোদী-ত’কাস্না গুইয়াদ আয় মান্ দীগারাম তো দীগারী।” অর্থাৎ আমি তুমি হলাম, তুমি আমি হলাম, আমি দেহ হলাম, তুমি প্রাণ হলে, এরপর কেউ যেন বলতে না পারে, আমি একজন আর তুমি আরেকজন।” হ্যরত শায়খ মুহিউন্দীন ইবনুল আরাবী মূলতঃ পবিত্র কুরআন নির্দেশিত স্বষ্টি সৃষ্টির সম্পর্কের বর্ণনাকে দার্শনিক ধারায় উপস্থাপন করেন। উল্লেখ করা সঙ্গত যে ওয়াহ্দাতুল ওজুদ এবং ওয়াহ্দাতুশ শহুদ (যা আল্লাহ ও বিশ্বজগত দুটি পৃথক সত্ত্বকে নির্দেশ করে) ইবনুল আরাবী (রহঃ) এ দুটির মধ্যে বিপরীত কিছু দেখেননি। অথচ তাঁর ওয়াহ্দাতুল ওজুদ মতবাদ প্রখ্যাত আউলিয়া হ্যরত শেখ আহমদ সারহিন্দ মুজাদ্দিদ-ই-আল ফেসানী (রহঃ) কর্তৃক সমালোচিত হয়েছে। খাজা রোকনুন্দিন (রহঃ) সর্বপ্রথম ওয়াহ্দাতুশ শহুদ মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর পর হ্যরত খাজা বাহাউন্দিন নক্ষবন্দ ওয়াহ্দাতুশ শহুদ মতবাদ গ্রহণ করেন এবং ব্যাপকভাবে

প্রচার করেন। হ্যরত মুজাদ্দিদ-ই-আল ফেসানী শহীদীয়া মতবাদের অনন্য কাণ্ডারী হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর মতে ‘আল্লাহকে লাভ করার পছ্টা কেবল ইশ্ক নয়-দাসত্বও একটি প্রকৃষ্ট পছ্টা। তিনি আরো উল্লেখ করেন, “আল্লাহর নৈকট্যের শেষ মোকাম দাসত্ব। আল্লাহর সাথে বান্দার কখনো মিলন হতে পারেনা। স্রষ্টা মূল এবং বিশ্বজগত তার প্রতিবিষ্ম। প্রতিবিষ্ম কখনো মূল হতে পারে না।”

মুজাদ্দিদ-ই-আল ফেসানী (রহঃ)-এর বক্তব্য অনেক পরে হলেও ইবনুল আরাবী এ বিষয়ে তাঁর সমালোচকদের প্রতি শালীন ভাষায় যে মতব্য করেছেন তা কালোভীর্ণ হিসেবে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর (রহঃ) ব্যক্তিগত গুণাবলী ছিল অধিক, যাতে দর্শক বা আগম্ভুক মাত্রই সম্মোহিত হতেন। চারিত্রিক শুভতা, সততা, সুউচ্চমানের সুফিত্ত, তত্ত্বজ্ঞান ও সাহেবে মারিফাত দর্শনে সকলে অভিভূত এবং বিশ্মিত হয়ে যেতেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর গুণাবলী এবং রাসূলুল্লাহ (দঃ) অনুপম বৈশিষ্ট্যের সুস্ম আমলকারী। এজন্য সমালোচকরা নেতৃত্বাচক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর মতাদর্শের বিরোধিতা করলেও তাঁর ব্যক্তি চরিত্র এবং আমলের সমালোচনা করার সাহস করেননি। প্রথম দিব্য জ্ঞানের অধিকারী, নূরের জলোয়ার আত্মস্থিতি এবং ঐশ্বী ইশ্কে সার্বক্ষণিক মওজে থাকার পরও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিন্দু, বিনয়ী এবং সহিষ্ণু স্বভাবের। এ কারণে ভিন্ন মতাবলম্বী এবং সমালোচকদের বক্তব্যের জবাব দিয়েছেন তিনি এভাবে, “সমস্ত ময়হাব ও শরীয়তের মূল এবং হাকীকত এক।”

হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর (রহঃ) বিশ্বাস অনুযায়ী দুনিয়াতে এক ভিন্ন দ্বিতীয় ওজুদ নেই। সমগ্র মখলুকাতের ‘ওজুদ’ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই ওজুদ। ওয়াহ্দাতুল ওজুদের সিলসিলায় ইবনুল আরাবী দুটি নীতির ধারনা দিয়েছেন। একটি হাকীকতে মুহাম্মদীয়া, অপরটি ওয়াহ্দাতে আদীয়ান।

হাকীকতে মুহাম্মদীয়া বিষয়ে তিনি দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি কখনো বলেছেন ‘কুতুব’, আবার ‘রংহের খাতেম’ উল্লেখ করেছেন। উপর্যুক্ত দুটি বিষয়কে ইলমে আমলী কামালিয়াতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম উৎস হিসেবে ধারণা দিয়েছেন। হ্যরত আদম (আঃ) হতে সকল নবী-পয়গম্বর হাকীকতে মুহাম্মদীয়া রূপে সকল নবীর মধ্যে আলোকের উৎস হিসেবে বিদ্যমান ছিলেন। মহানবী (দঃ)-এর ওফাতের পর তাঁর প্রথম পর্যায়ের অনুসারীদের মধ্যে ‘হাকীকতে মুহাম্মদী’ কার্যকর ছিল। মহানবী (দঃ) থেকে প্রাপ্ত

প্রশিক্ষণ অনুযায়ী তাঁরা তা ব্যক্তি ও সমাজজীবনে সর্বাবস্থায় প্রতিফলনে সচেষ্ট থাকেন।

হ্যরত ইবনুল আরাবীর ‘ওয়াহ্দাতে আদীয়ান’ অনুযায়ী সমস্ত ময়হাব এবং শরীয়তের হাকীকত এক। প্রত্যেক ময়হাব এবং শরীয়তের চরম লক্ষ্য হলো আল্লাহপাকেরই সত্ত্বার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং ধাবিত হওয়া। সকল সৃষ্টি এই জাত সত্ত্বার নিকট অঙ্গীকার প্রদান করে সৃষ্টি। সুতরাং-প্রত্যেক সৃষ্টির কেন্দ্র বিন্দু এক ও অভিন্ন। শায়খুল আকবরের (রহঃ) ওয়াহ্দাতে আদীয়ান ধারণা হচ্ছে মাইজভাঙ্গার দরবার শরিফের প্রতিষ্ঠাতা গাউসুল আয়ম মাইজভাঙ্গারী প্রবর্তিত ‘তাওহীদে আদীয়ান’। এটি হচ্ছে ‘জামে উত্ত তনজিহ ওয়াত্তশবীহ’।

হ্যরত শায়খুল আকবর মূলতঃ বিভিন্নভাবে ময়হাবে ইশ্কের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মহান আল্লাহকে প্রেমাস্পদ হিসেবে গ্রহণ করে তার প্রতি সার্বিক আনুগত্য প্রদর্শন এবং প্রেমাস্পদের সকল অভিপ্রায়কে কোন প্রকার সংশয়-সন্দেহ ব্যতীত মেনে নিয়ে কার্যকর করা হচ্ছে প্রেমিকের ধর্ম। উল্লেখ করা বাস্তিত যে প্রেমাস্পদের সঙ্গে প্রেমিকের সম্পর্কের ভিত্তি পারস্পরিক। পরিপূর্ণ আস্তা অর্জনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পায়। প্রেমাস্পদের আস্তা অর্জনের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ ক্রটি-বিচ্যুতি সন্দেহ-সংশয় অগ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ প্রেমিককে প্রেমাস্পদের মধ্যে অন্তলীন হয়ে প্রেমাণুগে দুঃখ হয়ে ‘মাশুক আশেকাস্ত-আশেক মাশুকাস্তে’ পরিণত হতে হয়। এ ময়হাবে স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব অদৃশ্য হয়ে যায়।

হ্যরত মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর (রহঃ) ‘সাহেবে কশ্ফ’ সম্পর্কে তাঁর প্রতিপক্ষদের কোন সংশয়-সন্দেহ ছিল না। তাঁর কামালিয়াত এবং বুজুর্গী সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তুলেননি। এ ধরনের মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের পরিত্র অন্তর্দৃষ্টিতে ‘খাতেমুল অলদ’ সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক পূর্বাভাব প্রদান আশ্চর্যের কিছু নয়। তিনি ‘ফুসুসুল-হেকম’ রচনার প্রেক্ষাপট হিসেবে স্বপ্নযোগে মহানবী (দঃ)-এর নির্দেশ এবং তথ্য সরবরাহের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মাইজভাঙ্গার দরবার শরিফ সম্পর্কে সাধক কবি উল্লেখ করেছেন, “গাউসুল আয়ম মাইজভাঙ্গারী ভবে আসিলে-জুমলা-আলম থর থরায় তাঁর নাম শুনিলে।” (চলবে)

সোনালী অতীতের কুশলী নির্মাতা ইবনে মাজাহ

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ আল-রাবি আল-কুয়াজুইনী সাধারণতঃ ইবনে মাজাহ নামে পরিচিত, মধ্যযুগের একজন হাদিস বিশারদ। তিনি হাদিস বিষয়ক ছয়টি প্রধান গ্রন্থের সর্বশেষটি, সুনান-এ-ইবনে মাজাহ-এর সংকলক।

জীবনী

ইরান-এর বর্তমান কুয়াজুইন এলাকায় ইবনে মাজাহ-এর জন্ম ও ইন্তিকাল স্থান।

নাম ও পরিচিতি: ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ)-এর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ, পিতার নাম ইয়াযীদ, উপনাম আবু আব্দুল্লাহ, উপাধি (আল-হাফিয়ুল কাবীর), নিসবতী নাম আর-রাবঙ্গ, আল-কায়ভীনী। তিনি ইবনু মাজাহ নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর পুরো বংশপরিক্রমা হল- হাফিয়ুল কাবীর আল-মুফাসিসির আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাজাহ আর-রাবঙ্গ আল-কায়ভীনী। ইবনু মাজাহ-এর ‘মাজাহ’ নামটি কার উপাধি, এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মাজাহ তাঁর পিতার উপাধি, আবার কেউ বলেন, তাঁর দাদার উপাধি। এ মতবিরোধ নিরসনকলে ‘তাহয়ীবুল আসমা ওয়াল লুগাত ফিল কামুস’ গ্রন্থের প্রণেতা বলেন, ‘মাজাহ’ তাঁর পিতার উপাধি, দাদার নয়। আর বিশুদ্ধ অভিমত হল প্রথমটি। শাহ আব্দুল আয়ীয় মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) ‘বুসতানুল মুহাদ্দিসীন’ গ্রন্থে লিখেছেন, মাজাহ ছিল তাঁর মায়ের নাম। তিনি আরো বলেন, ইবনু মাজাহ মুহাম্মাদের সিফাত, আব্দুল্লাহর নয়। তিনি ২০৯ হিজরী মোতাবেক ৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর কায়ভীনে জন্মগ্রহণ করেন। মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা ও ছমান বিন আফফান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে এ শহরটি বিজিত হয়। এ শহরের প্রথম গভর্নর বা প্রশাসক ছিলেন বিশিষ্ট ছাহাবী বারা ইবনু আয়েব (রাঃ)।

শিক্ষাজীবন: ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) নিজ দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন। এরপর তিনি কুরআনুল কারীম হিফয় সম্পন্ন করেন। অতঃপর উচ্চশিক্ষা অর্জন এবং হাদিস সংগ্রহের জন্য তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ ও

জনপদের যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছেন। ইমাম ইবনু মাজাহ ২৩০ হিজরী মোতাবেক ৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ২২ বছর বয়সে হাদিস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শহরের মুহাদ্দিসগণের নিকটে গমন করেন। আল্লামা আবু যাহু ‘হাদিস ওয়াল মুহাদ্দিস’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘ইবনু মাজাহ (রহঃ) হাদিস লিপিবদ্ধকরণ এবং শিক্ষার্জনের জন্য রায়, বছরা, কৃফা, বাগদাদ, সিরিয়া, মিসর, হেজায প্রভৃতি দেশ ও জনপদে ভ্রমণ করেন এবং বহু মনীষীর নিকট থেকে হাদিস সংগ্রহ করেন। আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী ও নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী তাদের গ্রন্থে লিখেছেন, অর্থাৎ ‘হাদিস সংগ্রহের জন্য ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) ইরাক, বছরা, কৃফা, বাগদাদ, মঙ্গা, সিরিয়া, মিসর, রায় প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন’। ইবনু হাজার আসক্তালানী (রহঃ) বলেন, ‘তিনি খোরাসান, ইরাক, হেজায, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের মনীষীদের নিকট থেকে হাদিস শুনেছেন। হাদিস সংগ্রহের জন্য কষ্টকর দেশ ভ্রমণের পরে তিনি ১৫ বছরের অধিক সময় ইলম চর্চায় নিমগ্ন থাকেন’।

শিক্ষকমণ্ডলী: ইবনু মাজাহ (রহঃ) দেশ-বিদেশের অনেক মনীষীর নিকট শিক্ষাগ্রহণ ও হাদিস সংগ্রহ করেছেন। তাঁর অসংখ্য উস্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- হাফেয আলী ইবনু মুহাম্মাদ আত-তানাফিসী, জুরারাহ ইবনুল মুগাল্লিস, মুসয়াব ইবনু আব্দুল্লাহ আয়-যুবাইরী, সুয়াইদ ইবনে সান্দে, আব্দুল্লাহ ইবনু মু'আবিয়া আল-জুমাহী, মুহাম্মাদ ইবনু রহমহ, ইবরাহীম ইবনুল মুনয়ির আল-হিফমী, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর, আবু বকর ইবনু আবু শায়বা, হিশাম ইবনু আম্বার, ইয়াযীদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইয়ামামী, আবু মুছ'আব আয়-যুহরী, বিশর ইবনু মু'আয আল-আকাদী, হুমাইদ ইবনু মাসয়াদা, আবু হ্যাফা আস-সাহমী, দাউদ ইবনু রুশাইদ, আবু খায়সামা, আব্দুল্লাহ ইবনু যাকওয়ান আল-মুকবেরী, আব্দুল্লাহ ইবনু আমের ইবনে বাররাদ, আবু সান্দে, আল-আমায়া, আব্দুর রহমান ইবনু ইবরাহীম দুহাইম, আব্দুস সালাম ইবনু আসেম আল-হিসিনজানী, ওসমান ইবনু আবু শায়বা প্রমুখ। বহু মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদিস শিক্ষাগ্রহণ ও সংগ্রহ করলেও ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) তাঁর সবচেয়ে প্রিয়তম উস্তাদ আবু বকর ইবনু আবু শায়বা নিকট থেকে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছেন।

ছাত্রবৃন্দ: ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ)-এর অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হলেন ইবরাহীম ইবনু দীনার আল-হাওশাবী, আহমাদ ইবনু ইবরাহীম আল-কায়ভীনী (তিনি হাফেয আবু ইয়া'লা আল-খলীলীর দাদা), আবুত তাইয়েব আহমাদ ইবনু রাওহিন আল-বাগদাদী আশ-শা'রানী, আবু আমর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে হাকীম আল-মাদীনী আল-ইস্পাহানী, ইসহাক ইবনু মুহাম্মাদ আল-কায়ভীনী, জা'ফর ইবনু ইদরীস, হোসাইন ইবনু আলী ইবনে ইয়ায়দানিয়ার, সোলায়মান ইবনু ইয়ায়ীদ আল-কায়ভীনী, আবুল হাসান আলী ইবনু ইবরাহীম ইবনে সালামা আল-কায়ভীনী, আলী ইবনু সাঈদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আসকারী, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আস্-সাফিফার প্রমুখ।

ইত্তিকাল: ইবনু মাজাহ (রহঃ)-এর ইত্তিকালের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইবনু কাছীর ও জামালুদ্দীন ইউসুফ আল-মিয়য়ী তাঁর ইত্তিকালের তারিখ, জানায়া ও দাফনকার্য সম্পাদন সম্পর্কে বলেন, ‘ইবনু মাজাহ (রহঃ) ২৭৩ হিজরী ২২ রামাযান মোতাবেক ২০ নভেম্বর ৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে সোমবার ইত্তিকাল করেন। পরের দিন মঙ্গলবার তাঁকে দাফন করা হয়। ইত্তিকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। কেউ কেউ বলেন, তিনি ২৭৫ হিজরীতে ইত্তিকাল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি ২৭৩ হিজরী রামাযান মাসে ইত্তিকাল করেন। তবে প্রথম অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ। তাঁকে গোসল করান মুহাম্মাদ ইবনে আলী কেহেরমান এবং ইবরাহীম ইবনে দীনার। জানায়া ইমামতি করেন স্বীয় ভাই আবু বকর এবং কবরে লাশ নামান তার ভাই আবু বকর ও আবু আব্দুল্লাহ এবং স্বীয় পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়ায়ীদ।

গ্রন্থ রচনা

আল-দাহাবীর মতানুসারে ইবনে মাজাহ-এর প্রধান রচনাগুলো হলো:

সুনান-এ-ইবনে মাজাহ: প্রধান ছয়টি হাদিস গ্রন্থের একটি কিতাব আত-তাফসীর: আল-কুরআন-এর তাফসীর কিতাব আত-তারিক: ইতিহাস গ্রন্থ, মূলতঃ হাদীসের বর্ণনাকারীদের তালিকা

সুনান-এ-ইবনে মাজাহ

মূল নিবন্ধ: সুনান-এ-ইবনে মাজাহ

সুনান-এ-ইবনে মাজাহ একটি হাদিস সংকলন, যেখানে ১,৫০০ অধ্যায় ও ৪,০০ হাদিস রয়েছে।

এই গ্রন্থটি সমাপ্ত করার পর তিনি এটি তৎকালীন সময়ে

হাদীসের অন্যতম পণ্ডিত আবু জুরাহ-কে পড়তে দিলে, পড়ার পর তিনি মন্তব্য করেছিলেন, “আমি মনে করি এটি মানুষের নিকট পৌছানো উচিত, অন্যান্য সঙ্কলন, বা তাদের বেশিরভাগই, পরিত্যাজ্য হয়ে পড়বে।”

-উইকিপিডিয়া হতে

সুফি উদ্ধৃতি

- আউলিয়াদের পক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা কঠিন কোন কাজ নেই।
- স্বাদে তৃষ্ণি আর চেষ্টায় বিশ্বাস এ দুটোকে ত্যাগ করতে পারলেই দাসত্বের হক আদায় হয়।
- নিজেকে নিয়ামতের অনুপযুক্ত বলে ধারণা করাই শোকর বা কৃতজ্ঞতা।
- যে স্থানে মিথ্যা না বললে রক্ষা পাওয়া মুশকিল সে স্থানেও মিথ্যা না বলা প্রকৃত সত্যনিষ্ঠা।
- প্রকৃত ফকীরের লক্ষণ হল সে কারও কাছে কিছু চায় না, কারও সাথে ঝগড়া করে না, কেউ ঝগড়া করতে চাইলেও চুপ করে থাকে।
- ধৈর্য মানুষকে বিনা প্রার্থনায় ও বিনা মিনতিতে আল্লাহর সাথে লিঙ্গ রাখে।
- রূজী-রোজগার উপার্জন না করার নামও তাওয়াক্তুল।
- দোজাহানের কারও চেয়ে নিজেকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ মনে না করা, আর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও মুখাপেক্ষী না হওয়াই হল ন্যৰতা বা বিনয়।

-হ্যরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)

ফীহি মা ফীহি

(মওলানা রূমীর উপদেশ বাণী)

অনুবাদকের আরঘ

মওলানা রূমী (রহঃ) ইসলামী সূফী সাধকদের অন্যতম। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি তাঁর ভঙ্গুল ও শিষ্যদের উদ্দেশ্যে অনেক উপদেশ বাণীও রেখে গিয়েছেন। এমনই একটি উপদেশের বই হচ্ছে “ফীহি মা ফীহি” (এতে নিহিত যা এতে নিহিত)। বইটি ১৯৬১ সালে প্রকাশ করেন যুক্তরাজ্যের এ, জে, আরবেরী। আমরা অনলাইনে তা পেয়ে অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছি। এ সাইটে বইটি বাংলায় হালনাগাদ হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। - কাজী সাইফুল্লাহিন হোসেন

মুখ্যবন্ধ: মওলানা জালালউদ্দীন রূমী (রহঃ)-এর কাব্য সাম্প্রতিককালে জনপ্রিয় ও সর্বজনবিদিত হয়েছে। এর পেছনে অবদান রেখেছে কোলম্যান বার্কস্ট, রবার্ট বণ্টায় ও অন্যান্যদের নতুন অনুবাদগুলো। মওলানার ভাস্তর প্রেমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা যাঁর আছে, তিনি তাঁর মহাকাব্যে অবগাহন করতে পারেন। কিন্তু তাঁর সূক্ষ্ম জ্ঞান যদি আপনি উপলব্ধি করতে চান এবং তাঁর কাব্যের মর্মবাণীর অন্তর্দৃষ্টি অনুভব করতে আগ্রহী হন, তবে মওলানার এই উপদেশমূলক ভাষণ সে দ্বারের চাবিকাঠি হতে পারে।

প্রকাশকদের জানামতে এই প্রকাশনার আগে মওলানা রূমী (রহঃ)-এর সবগুলো ভাষণের অনুবাদ-ই বিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ করেছিলেন, যাঁরা ছিলেন বিদ্঵ান। তাঁদের প্রকাশিত বইপত্রে মওলানার বাণীর আক্ষরিক অর্থ যেখানে সংযতে নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে, সেখানে এই অনুবাদে তাঁর দেয়া প্রকৃত বার্তা বহনকারী বক্তব্যের সূক্ষ্ম প্রভাব ফিরিয়ে আনার প্রয়াস পাওয়া গিয়েছে।

মওলানা রূমী (রহঃ) শুধু শিক্ষণীয় ঘটনাবলী বর্ণনা করছেন না, কিংবা তাঁর দর্শন ও ধর্মীয় উপলব্ধি ব্যক্ত করছেন না, যেমনটি আলোকপাত করা হয়েছিল পূর্ববর্তী অনুবাদগুলোতে, বরং এখানে তাঁর বাণী এক মহান আদর্শ প্রচারের জন্যেই শৈল্পিক-কৌশল অবলম্বন করেছে। সূফী বুর্যুর্গবৃন্দ প্রায়ই যা বলে থাকেন, সে মোতাবেক এ বিষয়টি বাইরে থেকে অধ্যয়ন বা মূল্যায়ন করা যায় না; এটিকে অন্তস্থল থেকেই খুঁজে পাওয়া যায়। এসব বক্তব্য মতপার্থক্যের সৃষ্টি করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ বিষয়ে মওলানার নিজস্ব

মতামত জানতে হলে আমাদেরকে শুধু তাঁর নিজস্ব ভাষণগুলোই বিশ্লেষণ করতে হবে। মওলানা রূমী (রহঃ) বারংবার সে সব লোকের সমালোচনা করেছেন যারা বিষয়াদির বাহ্যিক অর্থ নিয়েই ব্যস্ত থাকে, কিন্তু অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করতে পারে না।

অতএব, মওলানার উপদেশ-বাণী সম্পর্কে গবেষণা করতে যাঁরা আগ্রহী, শুধু তাঁদের কাছেই এর আবেদন সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু পাঠকমণ্ডলী যদি সংযতে এ বইটি পাঠ করতে ইচ্ছুক হন, তবে জীবনের সাথে মওলানার সম্পর্ক এবং (ঐশী)-প্রেমের সাথে তাঁরই আত্মিক মন্ততাপূর্ণ ঘনিষ্ঠিতার এক বৃহত্তর চিত্র তাঁরা দেখতে সক্ষম হবেন।

ভূমিকা: ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সূফী কবি হিসেবে স্বীকৃত মওলানা জালালউদ্দীন রূমী (১২০৭ - ১২৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর লেখনীর মাধ্যমে এমন এক খোরাক জুগিয়েছেন, যা শত শত বছর যাবত পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মের আধ্যাত্মিকতা-পিয়াসী মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর যুগেও সওদাগর ও রাজা-বাদশাহ, পুণ্যবান বান্দা ও বিদ্রোহী অন্ধেষী, বিখ্যাত আলেম-উলামা ও সাধারণ কৃষক, নারী ও পুরুষ সকলেই মওলানাকে খুঁজে বেড়াতেন। তাঁর জানায় মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী, আরবীয়, পারসিক, তুর্কী ও রোমান জনগোষ্ঠী (শেষ) শ্রদ্ধা জানাতে সম্বোধ হন। আসুন, সত্যান্ধেষীদের প্রতি মওলানার আহ্বান আমরা এক্ষণে মনোযোগ দিয়ে শুনি:

এসো, এসো, যে-ই হও না কেন তুমি,
কী পথহারা, কী পূজারী, কী হাল ছেড়ে দেয়ার মানসিকতা প্রেমী,
কিছু এসে যায় না তাতে, হয় না ব্যতিক্রমী,

আমাদের এ কাফেলা নয়কো হতাশার রাজ্যগামী,
এসো, যদিও শতবার প্রতিশ্রূতি ভঙ্গের দায়ে তোমার হয় বদনামী,
এসো, বার বার এসো, হে সত্যান্ধেষী, নিজ কল্যাণকামী!
[অনুবাদকের নোট: ওপরের পদ্যে উল্লেখিত ‘প্রতিশ্রূতি’ বিষয়টি সম্ভবতঃ ‘আল্লাহতা’লার সাথে মনুষ্যকুলের কৃত ইতিপূর্বেকার ওয়াদা - ‘আলাসতু বি-রাবিকুম’; আমরা প্রতিনিয়ত এই ওয়াদা ভঙ্গ করছি।]

সকল ধর্মের প্রতি মওলানা রূমী (রহঃ)-এর যে সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল, তা তাঁর যুগে সর্বদা জনপ্রিয় ছিল না। যার দরুণ আরও কট্টরপক্ষীদের তরফ থেকে প্রায়ই তাঁর

সমালোচনা হতো। এমনই এক ঘটনায় মুসলিম পণ্ডিত ইমাম কোনাভী (রহঃ) একবার মওলানাকে জনসমক্ষে চ্যালেন্জ করে বসেন। ইমাম কোনাভী (রহঃ) প্রশ্ন করেন, “আপনি দাবি করেন যে আপনি ৭২টি ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাথে একাত্ম। কিন্তু ইছদীরা খৃষ্টানদের সাথে একমত হতে পারেন না, আর খৃষ্টানরাও মুসলমানদের সাথে একমত হতে পারেন না। তাঁরা যদি একে অপরের সাথে ঐকমত্য পোষণ করতে না পারেন, তাহলে আপনি কীভাবে তাঁদের সবার সাথে ঐকমত্য পোষণ করতে পারবেন?” মওলানা রূমী (রহঃ) এর জবাবে বলেন, “হ্যাঁ, আপনি সঠিক। আমি আপনার সাথেও একমত।” [অনুবাদকের নোট: মওলানার এই ঐকমত্য সহিষ্ণুতাপূর্ণ সহাবস্থানের, যেটি সূফী আদর্শ বটে]

রাজা-বাদশাহবর্গ যদিও বা মওলানা রূমী (রহঃ)-এর অনুসারী ছিলেন, তবুও তাঁর সমালোচকরা কখনোই এটি অনুধাবন করতে পারেনি কেন তাদের ভাষায় “দর্জি, বন্ধু ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র দোকানির মতো সভ্যতা-ভব্যতাহীন উচ্ছ্বেল লোকদের” প্রতি তাঁর পরম স্নেহ ও নিষ্ঠা ছিল অবারিত। কিন্তু এই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সঙ্গি-সাথীদের বেলায়ও মওলানা কখনো আত্মাঘার অবকাশ দেননি। একদিন এমনই এক ঘটনায় মওলানা ছিলেন গভীর ধ্যানে মগ্ন। তাঁর খেদমতে ছিলেন তাঁরই শিষ্যবৃন্দ। অকস্মাত এক মদ্যপ বা মাতাল লোক এসে চিৎকার করতে লাগলো এবং মওলানার দিকে এগোতেই সে হোঁচট খেয়ে তাঁর গায়ের ওপর গিয়ে পড়লো। মওলানার শিষ্যবৃন্দের কাছে তাঁদের মৌর্শেদের এই অপমান অসহনীয় ছিল, তাই তাঁরা সবাই একযোগে সেই অজ্ঞ আহামক লোকটিকে শায়েস্তা করার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। মওলানা রূমী (রহঃ) তাঁদের হাত তুলে থামিয়ে দিলেন এবং বলেন, “আমি মনে করেছিলাম ওই অবাঙ্গিত প্রবেশকারী লোকটি-ই বুঝি মাতাল; এখন দেখছি আমার মুরীদ তথা শিষ্যরাই মাতাল!”

এমন হাজার হাজার মানুষ আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন যে মওলানা রূমী (রহঃ)-এর বারাকাত (আধ্যাত্মিক উপস্থিতি) আজো বিরাজমান এবং এখনো (তিনি) মানুষকে শেখাচ্ছেন [এই অধম অনুবাদক-ও তাই বিশ্বাস করি]। এটি সত্যি হলে এর এক বড় কারণ হচ্ছে তাঁর লেখনী ও কাব্যে অবস্থিত লক্ষণীয় প্রাণশক্তি; আর ওই লেখনী ও কাব্যের প্রাসঙ্গিকতা-ও, যা আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছে থাকে। মওলানার কবিতা তার গভীরতা ও সৌন্দর্যের দরূন সারা বিশ্বের আধ্যাত্মিকতা-পিয়াসী মানুষের অন্তরসমূহ জয় করে নিয়েছে।

তাঁর কাব্যের ছত্রগুলো জীবনের বিস্তৃত অবাধ দৃশ্যপট ফুটিয়ে তোলে, মানুষের দুঃখকষ্ট ও খোদাইভি থেকে আরম্ভ করে খোদাতা'লার গোপন পরিকল্পনার সর্বজনীন ব্যাপ্তি সবই তাতে বিধৃত। মওলানার কাব্য এক্ষেত্রে মনে হয় যেন অগাধ জ্ঞানের ভাণ্ডার, যার কোনো শেষ-ই নেই।

মওলানা রূমী (রহঃ) আমাদের কাছে রেখে গিয়েছেন আরেকটি পাঞ্জলিপি, যেটি তেমন সুপরিচিত নয়। এতে রয়েছে তাঁর শিষ্যদের প্রতি প্রদত্ত উপদেশমূলক বাণী। ‘ফীহি মা ফীহি’ (‘এতে নিহিত যা এতে নিহিত’) হলো এই আধ্যাত্মিকতাসমূহ ভাষণ বা আলাপেরই একখানা দলিল, যে ভাষণগুলো প্রায় সময়-ই সেমা তথা কাব্যগীতি ও ওয়াজদ তথা মওলানার সময়কার তুরস্কের কোনিয়া অঞ্চলের নেহায়েত বিষন্ন মানুষের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ও আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাস সৃষ্টির লক্ষ্যে রূমী (রহঃ) কর্তৃক সূচিত এবং বর্তমানে বিখ্যাত ঘূর্ণিয়মান দরবেশের দৈহিক স্পন্দনের পরে প্রদান করা হতো।

বর্তমান এই বইটি এ, জে, আরবেরীর মূল অনুবাদ থেকে সম্পাদিত ও পুনর্লিখিত হয়েছে, যেটি ১৯৬১ সালে “ডিসকোর্স অফ রূমী” [মওলানা রূমী (রহঃ)-এর উপদেশ বাণী] শিরোনামে প্রকাশিত হয়। আরবেরী নিজেই স্বীকার করেছেন যে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সাহিত্যকর্ম “সহজে পাঠের উপযোগী কোনো বই নয়, আর মূল বইটিও কোনোক্রমেই সর্বদা সহজে বোধগম্য হওয়ার নয়।” মূল পাঞ্জলিপির আরও সাম্প্রতিককালের গবেষণা (যেমন চিকিৎস ও শাহ) অনুযায়ী, আরবেরীর অনুবাদেও কিছু পারিভাষিক ত্রুটি বিদ্যমান; অধিকন্তু, মওলানার সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক শিক্ষার আরও যথাযথ উপলক্ষ্মি বর্তমান গবেষণায় পাওয়া যায়। আমি আশা করি, এই সংস্করণ ওই সব উদ্দৃতিকে স্পষ্ট প্রতীয়মান ও খোলাসা করতে সহায়তা করবে এবং অধ্যাপক আরবেরীর অবদানের ওপর ভিত্তি করে আমাদের আরও এগিয়ে নেবে।

উপরন্তু, মওলানা রূমী (রহঃ) ঘনঘন কুরআন মজীদ থেকে অসংখ্য আয়াতে করীমার উদ্ভৃতি দিয়েছেন তাঁর এ বইতে। যেহেতু তাঁর শ্রোতামণ্ডলীর সবাই আল-কুরআন ভালো জানতেন ও বুঝতেন, সেহেতু সেসব উদ্ভৃতি ছিল তাঁদের পরিচিত ও ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। তবে এই বইয়ের অনেক পাঠকের কাছেই সেরকম হবে না। তাই কুরআন মজীদের সাথে অপরিচিত পাঠকদের কাছে যেসব উদ্ভৃতি বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে, বা মওলানার বার্তার দিক পরিবর্তন করিয়ে দিতে পারে, সেগুলো আমি অপসারণ

করেছি।

খোদাতা'লার প্রতি মওলানা রূমী (রহ:)-এর সম্মোধন সর্বদাই গভীর ব্যক্তিগত সংশ্লিষ্টতার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি “আল্লাহ” কিংবা “মাহবুব” (প্রেমাস্পদ) শব্দগুলোর মধ্যে যেটি-ই ব্যবহার করুন না কেন, এতে তিনি পরম করুণাময়ের ঘনিষ্ঠিতাই ব্যক্ত করেছেন মাত্র। মওলানার পারসিক ভাষায় ‘খোদা’ শব্দটি পুরুষ বা স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত নয়, আর খোদাতা'লার উদ্দেশ্যে তাঁর ব্যবহৃত রূপক ভাষায় মহান প্রভুর প্রতিচ্ছায়া যেমনটি হলো ‘প্রেমাস্পদ’ ও ‘মহাসাগর’, ঠিক তেমনি ঘনমন্ডল ব্যবহৃত খেতাব হলো ‘রাজাধিরাজ’।

মওলানা রূমী (রহ:)-এর প্রতিচ্ছায়াগুলোর প্রবাহ, ছন্দ ও প্রভাব-ই আমি সবকিছুর ওপরে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছি। তিনি বাহ্যত যে মর্মবাণী পৌঁছাতে চান, তার চেয়ে এই অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম বিষয়গুলো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর এ আলোচনার ২৬তম অধ্যায়ে তিনি বলেন, “সাবধান! এ কথা বলো না, ‘আমি বুঝেছি।’ এ কথাগুলো যতো বেশি তুমি বুঝতে ও আস্থ করতে পারবে, ততোই এগুলোর উপলক্ষ থেকে তুমি দূরে সরে যাবে। এগুলোর অর্থ উপলক্ষ না করার মধ্যেই নিহিত।” এই অন্তর্দৃষ্টি বা উপলক্ষ ব্যাখ্যারও অতীত; আমাদেরকে এগুলো অন্তরের অন্তস্থলে অনুধাবন করতে হবে। আর এ কাজে আমাদেরকে পথনির্দেশনাস্বরূপ মওলানার রেখে যাওয়া সূক্ষ্ম চিহ্নগুলোর শরণাপন্ন হতে হবে।

এ পছায় মওলানা রূমী (রহ:)-কে অনুসরণ করুন এবং আপনি তখন দেখতে পাবেন মুক্তার হারের প্রতিটি মুক্তাকে বেঁধে রাখা সুতোটি। প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি প্রতিচ্ছায়াই হচ্ছে মওলানার নতুন আলোচনার মুহূর্ত; কিন্তু পূর্ববর্তী মুহূর্তের সাথে এর ছেদ পড়েছে কদাচিত। ধাপে ধাপে মওলানা নেচে বেড়াচ্ছেন। ওর খেই না হারিয়ে অনুসরণের জন্যে আমাদেরও হতে হবে নমনীয় ও নমনশীল। তবু মওলানার এ রকম তথা নাচের ছন্দ ও ধরনের আড়ালে লুকায়িত আছে তাঁরই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

এমন কি আজো মওলানা রূমী (রহ:)- আমাদের মৌলিক অনেক সাংস্কৃতিক ধারণাকে চ্যালেন্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন; আর তা এমন সব উপায়ে করছেন যা সচেতন না হলে আমরা লক্ষ্য না-ও করতে পারি। কোনো ধারণাকে সেকেলে কিংবা পূর্ববর্তী রীতিনীতির সমর্থনসূচক গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিকারী বলে প্রত্যাখ্যান করা খুবই সহজ। কিন্তু মওলানা রূমী (রহ:)-

এর ব্যাপারে ছুট করে এ রকম কোনো সিদ্ধান্ত কখনো নেয়ার ক্ষেত্রে আমি সতর্ক করবো। কেননা এতে তাঁর দ্বারা আপনার-ই কৃত ওই একই ভুল ধরার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১২ নং উপদেশ বাণীর আলোচনায় মওলানা রূমী (রহ:)- প্রশ্ন করেন, “কোনো সূফী/দরবেশ যিনি খোদাতা'লার রহস্যের হীরারত্ন (আধ্যাত্মিকতা) ধারণ করেন, তিনি কাউকে আঘাত করে নাক বা চোয়াল ভেঙ্গে দিলে দোষী সাব্যস্ত হবেন কে?” মওলানা দাবি করেন ওই দরবেশেরই প্রতি জুলুম করা হয়েছে। তিনি বলেন, “যেহেতু সূফী/দরবেশ খোদাতা'লার মাঝে বিলীন ও মাস্ত, সেহেতু তাঁদের কর্ম খোদাতা'লারই কাজ। আল্লাহ পাককে তো অন্যায়কারী বলা যায় না।”

প্রথম দর্শনেই এই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় উগ্রতার চিহ্ন বহন করে। স্পেনদেশীয় খ্ষণ্ঠান ইনকুইজিশানের সংঘটিত হত্যাকাণ্ড যে উগ্রতা থেকে নিঃস্ত হয়েছিল, এটিও মনে হতে পারে ওই একই ধরনের কোনো মতবাদ; আত্মপক্ষ সমর্থনের যে কোনো অজুহাত হতে ভিন্ন কিছু নয়। আমরা বলে থাকি, নিজেদের পছন্দের জন্যে খোদাতা'লাকেই দোষারোপ করা।

কিন্তু মওলানার কথাগুলো আরও মনোযোগসহ পড়ুন; তিনি সহিংসতাকে সমর্থন করছেন না, এর ন্যায্যতা তুলে ধরছেন না। তিনি জিজ্ঞেস করছেন কোনো কর্ম সঠিক না ভুল, ভালো না মন্দ, তা কীভাবে নির্ধারিত হবে। তিনি আমাদের বলছেন সঠিক ও ভুলের ব্যাপারে আমাদের সংস্কৃতিগত ধারণার চেয়েও গভীরে ভূব দিয়ে তালাশ করতে এর প্রকৃত কারণ; আর সে কারণ হলো খোদাতা'লার ইরাদা (ইচ্ছা)।

কিন্তু ব্যাপারটির এখানেই শেষ নয়, কেননা আমরা এখনো মওলানা রূমী (রহ:)-এর অন্তর্দৃষ্টি উপলক্ষ করতে পারিনি। আমাদের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ সঠিক বা সম্পূর্ণ ভুলের ধারণাগুলো প্রত্যাখ্যান করে। আমরা শেখেছি কোনটি সত্য তা আমাদের প্রত্যেকের নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে হবে; আর এ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে অন্য কারোর কর্তৃত্বের অধিকার নেই। অতঃপর শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত সংঘটিত মনের সংকীর্ণতাজনিত ধর্মীয় যুদ্ধবিগ্রহ ও গীর্জা-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত গণহত্যার পর আমরা সম্পূর্ণ তথা অবিমিশ্র সত্যের উর্ধ্বে আপেক্ষিক সত্যকে স্থান দিয়ে সামাজিকভাবে এ সমস্যাটির সমাধান করে ফেলেছি। আরেক কথায়, আমরা এখনো বিশ্বাস করি না যে ওই দরবেশের আঘাত করার কোনো অধিকার আছে।

মওলানা রূমী (রহ:)- এগুলোর সবই জানেন এবং তিনি এ

ব্যাপারে বহু দূর এগিয়ে আছেন। তাই তিনি আরও বলেন, “একজন পশ্চিমা লোক পাশ্চাত্যে বসবাস করেন। কোনো প্রাচ্যদেশীয় লোক বেড়াতে এলেন সেখানে। পশ্চিমা লোকটি প্রাচ্যদেশীয় লোকটির কাছে একজন অপরিচিত, অচেনা মানুষ। কিন্তু আসল অচেনা ব্যক্তিটি কে? ওই প্রাচ্যদেশীয় লোকটি কি গোটা পশ্চিমের কাছে অচেনা নয়?” আরেক কথায়, অবশ্যই কোনো পবিত্র যুদ্ধ কিংবা কোনো সূফী/দরবেশ কর্তৃক সহিংসতার ব্যবহার আমাদের কাছে অঙ্গুত ও ভুল প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু তার মানে কি সেটি ভুল? (সম্পূর্ণ) সত্যের সাথে আসলে কে অপরিচিত?

মওলানা আরও বলেন, “এই গোটা পৃথিবী একটি বাড়ির মতো। আমরা এর এ কক্ষ থেকে ও কক্ষ, কিংবা এক কোণা থেকে আরেক কোণায় গেলেও আমরা কি একই বাড়িতে অবস্থান করছি না? কিন্তু সূফী/দরবেশ যাঁরা খোদাতা'লার হীরা-জহরত (মানে আধ্যাত্মিকতা) লাভ করেছেন, তাঁরা এই বাড়ি ত্যাগ করে এর উর্ধ্বে উঠে গিয়েছেন। মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমান, “ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় আরম্ভ হয়েছে এবং ওই অবস্থায় ফিরে যাবে।”

এভাবে মওলানার বাণী কালোকীর্ণ হয়ে আজ আমাদের জিজ্ঞেস করে, “খোদাতা'লার কোনো খাঁটি প্রেমিক যে মহান প্রভুর এজায়ত (কর্তৃত) ধারণ করেন, তা কি তোমরা গ্রহণ বা স্থীকার করো? তাঁরা যা ধারণ করেন, সে জন্যে তাঁরা যে সদাসর্বদা এই দুনিয়ার কাছে অচেনা থাকবেন, তা কি তোমরা দেখতে পাও বা উপলব্ধি করো?” তাহলে প্রকৃত সেকেলে কে? অবশ্যই সেসব লোক যারা নিজেদের সময়কার সংস্কৃতির শেকলে আবদ্ধ; যারা এর চেয়ে উন্নততর (ঐশ্বী) কোনো আদর্শে উজ্জীবিত নয়।

আপনারা যদি দেখতে পান এখানে কী ঘটেছে, তাহলে বুঝতে পারবেন যে মওলানা রূমী (রহ:) আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন আমাদেরই নিজেদের অপরীক্ষিত তথা অ্যাচাইকৃত বিরূপতা ও অপচন্দগুলো ব্যবহার করে। মওলানার অনেক গভীর তাত্ত্বিক কাব্য এ ধরনের কষ্টকারীর্ণ হওয়ায় অবহেলিত হয়েছে, যার দরুণ তিনি ৩৫ নং আলোচনায় বলতে অনুপ্রেরিত হয়েছেন: “খোদাতা'লা কতোই না বিস্ময়করভাবে উদার! তিনি সেসব লোকের প্রতি সীলমোহর মেরে দিয়েছেন, যারা (কানে) শোনে কিন্তু বোঝে না, তর্কবিতর্ক করে কিন্তু তথাপিও কিছুই শেখে না। খোদা উদার। তাঁর গ্যব হচ্ছে উদার, এমন কি তাঁর খোলানো তালা-ও উদার। কিন্তু তাঁর

তালা খোলার তুলনায় তাঁর খোলানো তালা একেবারেই নগণ্য। কেননা, এই অনুগ্রহ হলো বর্ণনারও অতীত। আমি যদি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ি, তবে তা হবে খোদাতা'লার অসীম দয়ারই সুবাদে।”

এতে একটি কৌতুহলোদ্বীপক পর্যবেক্ষণের উভব হয়েছে। মওলানা কখনোই তাঁর আলোচনায় সার্বিকীকরণের রীতি মানতেন না; তিনি সুনির্দিষ্ট ঘটনা বা পরিস্থিতি সম্পর্কেই সবসময় আলাপ করতেন। তাঁর আশপাশে অবস্থিত মানুষজনের সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস ও দ্বন্দগুলো ছিল তাঁর বাণীর উপজীব্য; আর তিনি ছিলেন তাঁরই যুগে প্রকাশমান ‘পথটির’ একজন সাক্ষী ও মুখপাত্র। আর আজো তাঁর বাণী আমাদের শেখাতে পারে।

কোনো ভ্রমণকারী ৭০০ বছর আগে তার পথের ওপর একটি পাথরে হোঁচ্ট খেয়ে পড়ে গেলে এবং এ ঘটনায় তার জীবনের মোড় ঘুরে গেলে আমরা হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে পারবো যে ওই পাথরটি শুধু নৈমিত্তিক এক ব্যাপার ছিল। কিন্তু যদি ওই একই পাথর হাজার হাজার মানুষের শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত আছাড় খাওয়ার কারণ হয়, আর একেকজনকে একেক বার্তা ও একেক শিক্ষা দেয়, তাহলে কি আমরা তাকে নৈমিত্তিক বলতে পারবো? বোকা লোকেরা যখন আছাড় খায়, তখন তারা ওঠে দাঁড়ায় এবং হাঁটা আরম্ভ করে, যেন কিছুই হয়নি। তারা কিছুই শেখে না। জ্ঞানী মানুষ-ই কিন্তু তাঁর আছাড় খাওয়ার মধ্যে এক বৃহত্তর মানে খুঁজে পান। তবে যে পাথর প্রতিটি যুগে ভ্রমণকারীদের আছাড় খাইয়ে দেয়, আর এতে একেকবার একেক অর্থ জ্ঞাপন করে, সেটি কোনো পাথর নয়, বরং স্বয়ং খোদাতা'লা-ই এর কর্তা।

মওলানা রূমী (রহ:) কর্তৃক ব্যবহৃত অনেক শব্দ ইসলামী প্রেক্ষিতে বেশ ভিন্ন অর্থ বহন করে খৃষ্টানদের অর্থের তুলনায়। যেমন ‘বিশ্বাস’ শব্দটি অনেক সূফী/দরবেশদের মাঝে যে অর্থ জ্ঞাপন করে তার কাছাকাছি প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা মোটামুটিভাবে বলতে পারি ‘জ্ঞাত অবস্থা’। এটি কিন্তু সেই ‘বিশ্বাস’ শব্দটি নয়, যা দ্বারা কোনো ব্যক্তির পছন্দকৃত পথ ও মতকে বোঝায়। ‘কোয়েকারস্ট (Quakers) খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের কাছে এর কিছুটা কাছাকাছি অর্থবোধক ‘বিশ্বাসদায়ক’ শব্দটি ছিল, কিন্তু সেটিও ব্যাপকভাবে মানুষের এতদসংগ্রান্ত নিজস্ব পছন্দের বিষয়টির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। মওলানা যখনওবিশ্বাস’ শব্দটি ব্যবহার করেন, তখন তিনি কোনো মতবাদে বিক্রি হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে আলাপের চেয়ে কোনো সংঘিত অভিজ্ঞতার প্রভাবে কীভাবে আমাদের

জীবনদর্শন বদলে যায় সে ব্যাপারেই আলোচনা করেন বেশি। অনুবন্ধভাবে, মওলানা যখন ইসলাম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, তখনই তিনি ‘পথটিকে’ বুঝিয়েছেন। আজকে মানুষেরা যেমন ইসলাম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ না করেই পূর্ব-ধারণা পোষণ করছে, বা মওলানার সময়েও মানুষেরা যে ধারণা পোষণ করতো, সে ব্যাপারে কিন্তু তিনি আলোচনায় প্রবৃত্ত নন, বরং তিনি আলোকপাত করছেন খোদ আধ্যাত্মিক পথটির প্রতি এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য ও রীতিনীতির প্রতিও। মওলানা যেভাবে বুঝিয়েছেন, ঠিক সেভাবে বোৰা সবসময় সহজ নয়। যেমন, মওলানা রূমী (রহঃ) মহানবী (দঃ) হিসেবে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং খোদার কষ্টস্বরের যে উল্লেখ করেছেন, তাকে সহজে ধর্মীয় রীতি বা ঐতিহ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়; তবে তিনি যা আসলেই বলেছেন, এসব তার বাহ্যিক আবরণ মাত্র। আলোচনার ৭০তম অধ্যায়ে তিনি এই অঙ্গত সম্পর্কেই আলোকপাত করেন: “নর বা নারীরা যেখানেই বড় একটি তালা বোলায়, তা কোনো দামী বা মূল্যবান বস্ত্র চিহ্ন-ই বহন করে। যেমনভাবে কোনো সাপ রত্নভাণ্ডারকে পাহারা দেয়, তোমাদের যা প্রক্ষিপ্ত করে তা বিবেচনায় নেবে না, বরং তোমরা ওই ধনভাণ্ডারের মূল্যের দিকেই দৃষ্টিনিবন্ধ করবে।” আপনারা যদি এসব অনেক অর্থকে এ বইয়ের শিরোনামের মহাসাগরে মৎস্যের মতো সন্তরণ করতে দেখতে পান, তাহলে মওলানার লেখনী কীভাবে পড়তে হয় তা আপনারা জানবেন। এটি হয়তো আপনাদেরকে প্রকৃত মাছ শিকারেও সহায়তা করতে পারে [মানে আধ্যাত্মিকতা অর্জনে সহায়ক হতে পারে - অনুবাদক]। - ডাগ মারম্যান

[অনুবাদকের মন্তব্য: ভূমিকা লেখকের দ্বারা বইটির নামকরণ বিষয়ে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তা আমার কাছে মওলানার নামকরণের সাথে মেলেনি। আরবেরী-ই সঠিকভাবে তরজমা করেছিলেন ১৯৬১ সালে। তাই ডাগ মারম্যানের ভূমিকার কিছু অংশ বাংলায় অনুবাদ করা হয়নি।]

উপদেশ বাণী-১

মওলানা রূমী (রহঃ) বলেন: মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার ইরশাদ ফরমান, “উলামাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ হলো তারা, যারা রাজা-বাদশাহের দর্শনপ্রার্থী বা দ্বারস্থ হয়; আর রাজা-বাদশাহদের সেরা হলেন তাঁরা, যারা উলামা (-ই-হক্কানী/রবৰানী)-বুন্দের দর্শনপ্রার্থী হন। যে রাজা গরিবের দ্বারে গিয়ে দাঁড়ান, তিনি-ই জ্ঞানী;

আর যে গরিব লোকেরা রাজার দ্বারস্থ হয়, তারা হতভাগা।” এক্ষণে এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে মানুষেরা মনে করে উলামাবৃন্দের কথনোই রাজা-বাদশাহদের দ্বারস্থ হওয়া উচিত নয়। নতুবা তাঁরা সবচেয়ে মন্দ আলেমে পরিণত হবেন। আসলে এটি প্রকৃত অর্থ নয়। বরঞ্চ সবচেয়ে মন্দ আলেমবর্গ রাজা-বাদশাহদের ওপর নির্ভর করে, আর তাদের জীবন ও উদ্দেশ্য রাজা-বাদশাহদের মনোযোগ ও সু-নজরপ্রাপ্তির আবর্তে ঘুরে। ওই ধরনের আলেম পড়ালেখা শেখে রাজা-বাদশাহদের কাছ থেকে উপহারসামগ্ৰী ও সম্মান লাভ এবং উচ্চপদ পাওয়ার আশায়।

অতএব, ওই ধরনের আলেম নিজেদের উন্নত করে এবং জ্ঞানার্জন করে রাজা-বাদশাহদের বদৌলতে। তারা আলেম হয় নিজেদের রাজা-বাদশাহদের ভয়ে। তারা রাজার নিয়ন্ত্রণে নিজেদেরকে ছেড়ে দেয়। রাজা-বাদশাহবর্গ তাদের জন্যে যে পরিকল্পনার ছক আঁকে, সেটির সাথেই তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। তাই তারা রাজার দ্বারস্থ হোক, অথবা রাজাই তাদের দ্বারে যাতায়াত করুক, প্রতিটি ক্ষেত্ৰেই তারা হচ্ছে দর্শনপ্রার্থী; আর রাজা হলো দর্শনদাতা।

কিন্তু উলামাবৃন্দ যখন রাজা-বাদশাহদের তুষ্টির জন্যে জ্ঞানাব্বেষণ করেন না, বরং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সত্যের খাতিরেই জ্ঞানচৰ্চা করেন- যখন তাঁদের কথা ও কাজ তাঁদেরই শেখা সত্যাশ্রয়ী হয় ও সত্যের জন্যেই ব্যবহৃত হয়, কেননা এটি-ই তাঁদের প্রকৃতি এবং এটি ব্যতিরেকে তাঁদের জীবন অর্থহীন, মাছ যেমন না-কি শুধু পানিতে বাঁচতে সক্ষম- তবে ওই শ্ৰেণির আলেম খোদাতালার নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনায় নিজেদের সমর্পিত করেন নিঃসন্দেহে। তাঁরা আব্দিয়া (আ:)-মণ্ডলীর হেদায়াত (সঠিক পথনির্দেশনা) দ্বারা আশীর্বাদধন্য হন। তাঁদের সময়কার সকলেই নিজেদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁদেরই (আদর্শের) ছোঁয়া পান এবং তাঁদের দৃষ্টান্ত থেকে অনুপ্রেরণাও লাভ করেন।

এ ধরনের আলেম-উলামা (-ই-হক্কানী/রবৰানী) কোনো রাজার দর্শনপ্রার্থী হলেও বাস্তবে তাঁরাই হলেন দর্শনদাতা, আর রাজা হলেন দর্শনপ্রার্থী। কেননা, প্রতিটি ক্ষেত্ৰে রাজা-ই এসব আলেমের কাছ থেকে গ্রহীতা এবং তাঁদের সাহায্য-প্রাপকও। এ রকম আলেম রাজা-বাদশাহদের ওপর মোটেও নির্ভরশীল নন। তাঁরা হলেন আলো বিচ্ছুরণকারী সূর্যের মতো, যার সামগ্ৰিক কাজ-ই হলো সবাইকে দান করা, সৰ্বজনীনভাবে; যেমন, সাধারণ পাথরকে দামী মণিমানিক্যে রূপান্তর করা, পাহাড়পৰ্বতকে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও ইস্পাতের খনিতে

পরিগত করা, ভূ-ভাগকে উর্বর ও শস্যশ্যামল করা, গাছ-গাছালিকে ফলবতী করা এবং ঠাণ্ডা বাতাসে উষ্ণতা নিয়ে আসা। তাঁদের কারবার-ই হলো দান করা, তাঁরা গ্রহীতা হন না। আরবীয় সমাজ একটি প্রবাদ বাক্যে এটি ব্যক্ত করেন:

“আমরা শিখেছি করতে দান-সদকাহ,
শিখিনি কভু হতে গ্রহীতা।”

অতএব, যে উপায়েই তাঁদের সাথে দেখা করেন না কেন, রাজা-বাদশা-ই হলেন এক্ষেত্রে তাঁদের দর্শনপ্রার্থী।

এক্ষণে আমার মনে এক ভাবনার উদ্বেক হয়েছে যে আল-কুরআনের কোনো আয়াতের উদ্ধৃতি দেই, যদিও তা বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তথাপি এই চিন্তা আমার মনে এসেছে এখন, আর আমি তা ব্যক্ত করতে চাই যাতে তা লিপিবদ্ধ হয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ ফরমান:

“হে রাসূল, আপনার হাতে বন্দী লোকদের বলুন, আল্লাহত্তা’লা তোমাদের অন্তরে ভালো কিছু থাকলে তিনি যা নিয়েছেন, তার চেয়েও বেশি দান করবেন; আর তিনি তোমাদের ক্ষমা-ও করবেন। নিশ্চয় আল্লাহত্তালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতি দয়াবান।” (সূরা আনফাল-৭০)

এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (দণ্ড)-এর প্রতি সে সময় নায়িল হয়েছিল, যখন তিনি (মক্কার) অবিশ্বাসীদেরকে পরাভূত করেছিলেন; (যুদ্ধে) কেউ কেউ হয়েছিল নিহত, আর অনেকে হয়েছিল হাত ও পায়ে শেকলবন্দী। ওই বন্দীদের মধ্যে ছিলেন তাঁরই চাচা হ্যরত আব্বাস (রাঃ)-ও। শেকলাবদ্ধ বন্দীরা তাদের গুণিকর অসহায়ত্বে সারা রাত কেঁদেছিলেন এবং মাতম-ও করেছিলেন। তারা নিজেদের জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তরবারির ফায়সালা-ই আশঙ্কা করছিলেন ওই সময়। এ দৃশ্য দেখে মহানবী (দণ্ড)-এর ঠোঁটে স্মিতহাস্যরেখা ফুটে ওঠে।

বেদনাক্লিষ্ট বন্দীরা বল্লেন, “দেখো, তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাঝে শেষমেশ একজন মানুষের বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে। তিনি এক মহামানব হওয়ার যে দাবি করা হয়, তা সত্য নয়। আমরা বন্দীরা শেকলাবদ্ধ দেখে তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে আনন্দ অনুভব করছেন। নিজ প্রবৃত্তির অনুগত অন্য যে কারো মতো যখন-ই সে শক্রদের ওপর বিজয় লাভ করে এবং তাদেরকে নিজ মর্জি-মাফিক ধ্বংস করতে পারে, আর এতে আনন্দ ও সুখ খুঁজে পায়।”

মহানবী (দণ্ড) বন্দীদের অন্তরের খবর জেনে বল্লেন, “না, তা মোটেও নয়। আমি কখনোই আমার হাতে পরাস্ত শক্রদের

বিপর্যস্ত অবস্থা কিংবা দুঃখকষ্ট দেখে হাসাহাসি করবো না। তবে আমি উৎফুল্লবোধ করছি এবং হাসছি এ কারণে যে, অন্তর্দৃষ্টি (দিব্যদৃষ্টি) দ্বারা আমি দেখতে পাচ্ছি মানুষদেরকে ‘জামারুকলার’ ও শেকলে ধরে আমি জাহানামের কালো ধোঁয়া থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করছি; আর তারা কাঁদছে এবং অভিযোগ করছে এই বলে, ‘কেন আপনি আমাদেরকে এই আত্মবিনাশী গর্ত থেকে বের করে ওই নিরাপত্তাপূর্ণ বাগানে নিয়ে যাচ্ছেন?’ এমতাবস্থায় হাসি আমাকে আপ্তুল করছে।

“কিন্তু যেহেতু তোমাদেরকে এখনো ওই দিব্যদৃষ্টি দেয়া হয়নি যা আমাকে দেয়া হয়েছে, সেহেতু আমি তোমাদের বলছি, শোনো! আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে এ কথা জানানোর জন্যে আমাকে আদেশ করেছেন যে, প্রথমে তোমরা সৈন্য জড়ো করে তোমাদেরই শৌর্যবীর্যের ওপর নির্ভর করে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছো। তোমরা নিজেদের বলেছো, ‘আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়ী হবো এবং তাদেরকে নির্মূল করবো।’ কিন্তু তোমরা তোমাদের চেয়েও (সর্ব)-শক্তিমানের ওই ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারো নি। আর তাই তোমরা যা কিছু পরিকল্পনা করেছিলে, সবই উল্টো হয়েছে। এখনো তোমাদের ভয়-ভীতির মাঝেও তোমরা নিজেদের (প্রান্ত) বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছো এবং একক (পবিত্র) সন্তার বাস্তবতা দর্শনে ব্যর্থ হচ্ছে। ওই (ঐশ্বী) ক্ষমতা দর্শনের পরিবর্তে তোমরা আমার শক্তিকেই গণনায় নিয়েছো কেবল; কারণ আমার দ্বারা বিজিত হওয়ার ব্যাপারটি তোমাদের কাছে বেশি সহজে গ্রহণযোগ্য।

“তথাপি তোমাদের বর্তমান অবস্থাতেও আমি তোমাদের বলছি, তোমরা যদি আমার ক্ষমতাকে স্বীকার করো এবং সকল অবস্থায় তোমাদের লয়কে আমার ইচ্ছাধীন বলে মনে নাও, তাহলেও আমি তোমাদেরকে এই দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি দিতে পারবো। ওই মহান সন্তা যিনি সাদা বৃষের ওরসে কালো বৃষের জন্য দিতে সক্ষম, তিনি অবশ্যই কালো বৃষের ওরসে সাদা বৃষের জন্য-ও নিশ্চিত করতে সক্ষম। তোমাদের ইতিপূর্বেকার রীতি পরিত্যাগ করো, আমিও একইভাবে তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া সহায়-সম্পত্তি তোমাদের কাছেই আবার ফিরিয়ে দেবো; বস্তুতঃ আরও কয়েকগুণ বেশি দেবো। অধিকন্তু, আমি তোমাদের বিরুদ্ধে উঞ্চাপিত সমস্ত অভিযোগ থেকে তোমাদেরকে অব্যাহতি দেবো, আর ইহলোক ও পরলোকে তোমাদের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ মঙ্গল করবো।”

অতঃপর হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, “আমি তওবা করছি এবং পূর্ববর্তী রীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিছি।” রাসূলুল্লাহ (দঃ) এতদশ্রবণে বলেন, “আপনি যে দাবিটি করছেন, খোদাতা’লা তার একটি প্রতীক বা নমুনা দেখতে চান; কেননা ভালোবাসার বড়াই করা সহজ, কিন্তু এর প্রমাণ ভিল্ল কথা।” হযরত আব্বাস (রাঃ) পাল্টা প্রশ্ন করেন, “কী ধরনের প্রতীক বা নমুনা আপনি দেখতে চান?” হ্যাঁর পূর্ব নূর (দঃ) জবাবে বলেন, “আপনার কাছে অবশিষ্ট যে অর্থসম্পত্তি আছে, তা ইসলামী বাহিনীকে দান করুন, যাতে বাহিনী শক্তিশালী হতে পারে। অবশ্য তা তখন-ই হতে পারে, যখন আপনি সত্যিকার মুসলমান হবেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ভালাই কামনা করবেন।” হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, “হে আল্লাহর রাসূল (দঃ)! আমার কাছে আর কী থাকবে? তারা আমার থেকে সবই কেড়ে নিয়েছে, ঘর ছাওয়ার জন্যে ব্যবহৃত নলখাগড়ার শুকনো কাণুনির্মিত ফরাশ-ও রাখেনি।”

মহানবী (দঃ) জবাবে বলেন, “দেখুন, আপনি তো আপনার পূর্ববর্তী রীতি পরিত্যাগ করেননি। আপনি এখনো সত্যের বিভা দর্শন করেননি। আমি কি আপনাকে বলবো কী পরিমাণ সম্পত্তি এখনো আপনার মালিকানাধীন আছে? কোথায় তা আপনি লুকিয়ে রেখেছেন? কার জিম্মাদারিতে তা রেখেছেন? কোথায় তা লুকিয়ে বা পুঁতে রেখেছেন?”

হযরত আব্বাস (রাঃ) বিস্ফোরিত কর্তৃ বলেন, “আল্লাহ মাফ করুন!”

রাসূলুল্লাহ (দঃ) এরপর বলেন, “আপনি কি আপনার মায়ের জিম্মাদারিতে অতো পরিমাণ সম্পত্তি গচ্ছিত রাখেননি? অমুক দেয়ালের নিচে আপনি কি আপনার স্বর্ণ পুঁতে রাখেননি? আপনি কি আপনার মায়ের কাছে বিস্তারিতভাবে বলেননি এ কথা- ‘আমি ফিরতে পারলে এ সম্পত্তি আমাকে ফেরত দেবেন; কিন্তু নিরাপদে না ফিরলে অতো পরিমাণ অমুক কাজে এবং অতো পরিমাণ তমুক লোককে দেবেন; আর অতো পরিমাণ আপনার জন্যেই রেখে দেবেন?’”

হযরত আব্বাস (রাঃ) এ কথা শোনার পর পূর্ণ আনুগত্যে হাত উত্তোলন করেন এবং বলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ (দঃ)! ইতিপূর্বে আমি সবসময় মনে করতাম আপনি হামান, শাদাদ, নমরান্দ ও অন্যান্য অতীতকালের রাজা-বাদশাহর (জৌলুসময়) ভাগ্য বহন করে চলেছেন। কিন্তু আপনার এ কথা শুনে এখন আমি জানি, আপনার এই নেয়ামত (আশীর্বাদ) খোদায়ী (ঐশ্বী) কোনো দান, যা অপার্থিব এবং যা স্বয়ং খোদার আরশ থেকে এসেছে।”

মহানবী (দঃ) জবাবে বলেন, “এবার আপনি সত্য কথা বলেছেন। আপনার মধ্যে লুকায়িত সন্দেহের কোমরবন্ধ ছিঁড়ে যাওয়ার শব্দ আমি শুনেছি। আমার আত্মার অন্তঃস্ত্রে একখানা কান আমার আছে, যা দ্বারা কারো অন্তরে সন্দেহ টুটে যাওয়া আমি শুনতে পাই। আপনি যে এখন বিশ্বাস করেন (দ্বীন ইসলামে), এ বিষয়টি সত্য।”

আমি এ ঘটনাটি আমীর (শাসক)-কে জানিয়েছিলাম যে উদ্দেশ্যে তা হলো, শুরুতে আপনি (আমীর সাহেব) মুসলমান রাজ্যের নিশান-বরদার তথা পতাকা উড়োনকারী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছিলেন। আপনি বলেছিলেন, “আমি নিজেকে মুক্তিপণ্ডৰূপ পেশ করছি; আমি নিজ আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিচার-বিবেচনা কোরবানী করছি যাতে ইসলাম ধর্ম নিরাপদ ও শক্তিশালী থাকে।” কিন্তু যেহেতু আপনি খোদার চিন্তা ভুলে এবং সব কিছু তাঁরই সৃষ্ট এ কথা মনে না রেখে আপনার নিজস্ব পরিকল্পনার ওপর আস্থা রেখেছিলেন, সেহেতু আপনার সমস্ত উদ্দেশ্যেরই উল্টোটা হয়েছে। তাঁতারদের সাথে আঁতাত করে আপনি অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদেরকে সিরীয় ও মিসরীয়দের ধ্বংস করতে সহায়তা করছেন, যার পরিণতিতে ইসলামী রাজ্যেরই বিনাশ সাধন হতে পারে। এমতাবস্থায় আপনি ইসলাম ধর্মের টিকে থাকার জন্যে যে পরিকল্পনা করেছেন, খোদাতা’লা তারই বিনাশ সাধন করেছেন।

অতএব, খোদার দিকে মুখ ফেরান, কেননা পরিস্থিতি বিপজ্জনক। ওহে বন্ধু, তবু আপনার এ বর্তমান অবস্থাতেও নিরাশ হবেন না, বরং খোদার ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ করুন। আপনি মনে করেছিলেন আপনার আত্মিক শক্তি বুঝি আপনার নিজেরই, ঠিক যেমনিভাবে হযরত আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য বন্দীরা তা-ই ভেবেছিলেন; এর ফলে আপনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ (দঃ) যেমন ওই বন্দীদের দুঃখকষ্টে হেসেছিলেন, আমিও তেমনি আপনার বিব্রতকর অবস্থায় উৎফুল্লবোধ করছি। কেননা, এই দুর্বলতা ও কষ্টভোগ থেকে যা হারিয়েছে তার চেয়েও বড় কিছু অর্জিত হতে পারে। অতএব, নিরাশ হবেন না; কারণ

“খোদাপ্রদত্ত স্বত্তিতে কেউ হয় না নিরাশ,
ব্যতিক্রম শুধু যারা করে অবিশ্বাস।”

আমীরের সাথে আমার এভাবে কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল তিনি যাতে সব বিষয় সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে পারেন এবং খোদার ইচ্ছা সবিনয়ে মেনে নিতে পারেন। তিনি অত্যন্ত উচুঁ মর্যাদা থেকে অধঃপত্তি হয়েছেন; তবু এ উপায়ে

হয়তো তাঁর উন্নতি হতে পারে। জীবন সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহ (আমাদের) প্রদর্শন করতে পারে, কিন্তু এগুলোর উৎস সম্পর্কে ভুলে গেলে এগুলোর পেছনে লুকোনো রয়েছে এক বড় ফাঁদ। আল্লাহত্তা'লা-ই এই মহা-পরিকল্পনা করেছেন যাতে আমরা নিজেদের আতঙ্গরিতা ও অন্তঃসারশূন্যতার দরুণ এ সকল পরিকল্পনা ও ভাবনাকে নিজেদের বলে দাবি না করতে শিখি।

সব কিছু যদি যেভাবে বাহ্যতঃ দেখা যায় সে মোতাবেক সত্য হতো, তবে মহানবী (দঃ) এতো তীক্ষ্ণ, এতো আলোকিত অন্তর্দৃষ্টি (দিব্যদৃষ্টি) দ্বারা আশীর্বাদধন্য হওয়া সত্ত্বেও আরয় করতেন না -

“হে প্রভু, সকল বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা আমায় করুন প্রদর্শন; আপনি যে বস্তুকে দেখান সুদর্শন, বাস্তবে তার বিশ্বী আবরণ; আপনি যে বস্তুকে দেখান কদাকার, প্রকৃতপ্রস্তাবে তা সুদর্শন; আমাদের প্রতিটি বস্তু সেভাবে দেখান, যেটির বাস্তব অবস্থা যেমন, যাতে আমাদের না হয় সেটির ফাঁদে পতন।”

এক্ষণে তোমাদের বিচারবুদ্ধি যতো ভাল ও স্পষ্ট-ই হোক না কেন, তা নিশ্চয় মহানবী (দঃ)-এর বিচারবুদ্ধির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর নয়। অতএব, (তোমাদের) প্রতিটি চিন্তা ও ধারণার ওপর আস্থা রেখো না, বরং খোদাতা'লার প্রতি ও তাঁর ঐশ্বী জ্ঞান-প্রজ্ঞার ওপর আস্থা রেখো।

উপর্যুক্ত বাণী-২

কেউ একজন বলেন: “আমাদের শায়খ কোনো শব্দ উচ্চারণ করেন না।”

মওলানা রূমী (রহঃ) জবাব দিলেন: উত্তম, আমার চিন্তা-ই তোমাকে আমার উপস্থিতিতে নিয়ে এসেছে। আমার (সম্পর্কে) এই চিন্তা তোমাকে এ কথা বলেনি, ‘আপনার কী হাল?’ শব্দ বা বচনহীন চিন্তা-ই তোমাকে এখানে টেনে এনেছে। তোমাকে আমার বাস্তবতা যদি শব্দ (কথা) ছাড়াই কাছে টানে এবং তোমাকে অন্য কোথাও স্থানান্তর করে, তাহলে কথার মধ্যে আশ্চর্যের আর এমন কী আছে? কথাবার্তা হলো বাস্তবতার ছায়া, বাস্তবতার একটি শাখা মাত্র। ছায়া যেহেতু কাছে টানে, তাহলে বাস্তবতা যে আরও কতো বেশি তা করতে পারে!

কথাবার্তা হচ্ছে একটি অসীলা। যে বস্তু এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির কাছে টানে তা আন্তরিক বন্ধন, কথাবার্তা নয়। কেউ যদি কোনো নবী (আ:) বা ওলী (রহঃ)-এর কাছ থেকে এক লক্ষ্যবার-ও অলৌকিক ঘটনা (মো'জিয়া/কারামত) প্রত্যক্ষ

করে, কিন্তু সেসব অলৌকিকত্বের উৎস ওই নবী (আ:) বা ওলী (রহঃ)-এর সাথে আল্লাক সম্পর্ক না রাখে, তবে এসব অলৌকিক ঘটনার ফলাফল শূন্য হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের আলোড়িত করে যে বস্তুটি, সেটি এই অন্তঃস্থিত উপাদান-ই। যদি খড়ের মধ্যে হলুদাভ বাদামি রংয়ের কোনো উপাদান না থাকতো, তাহলে ওই খড় কখনোই হলুদাভ বাদামি রংয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতো না [মওলানা এখানে স্থির বিদ্যুতের কথা বলছেন]। এ দুটো একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকতো না, যদি তোমরা লোমশ চামড়া দিয়ে ওই হলুদাভ বাদামি রংয়ের উপাদানকে ঘষতেও। এ দুইয়ের মধ্যে আদান-প্রদানের ঘটনা লুকোনো একটি বিষয়, এটি দৃশ্যমান কোনো কিছু নয়।

ভাবনা-ই আমাদেরকে কাছে টানে। কোনো বাগান সম্পর্কে চিন্তা আমাদেরকে ওই বাগানে নিয়ে আসে। কোনো দোকান সম্পর্কে চিন্তা আমাদেরকে সেখানে টেনে নেয়। তবে এসব চিন্তার মাঝে এক ধোকা লুকায়িত আছে। তুমি কি কখনোই এমন নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় যাও নি, যেখানে যাওয়াটা তুমি ভেবেছিলে উত্তম, কিন্তু যেয়ে কেবল হয়েছো হতাশ? এসব চিন্তা তাহলে এক আচ্ছাদনের মতো, আর তাতে কেউ একজন রয়েছে লুকিয়ে। যেদিন বাস্তবতা তোমাকে কাছে টানবে এবং ভাবনার এই আচ্ছাদন অদৃশ্য হয়ে যাবে, সেদিন-ই কোনো নৈরাশ্য আর থাকবে না। তখন-ই তুমি বাস্তবতা যেভাবে আছে সেভাবে তাকে দেখতে পাবে, আর বেশি কিছু নয়।

“ওই দিন গোপন বিষয়গুলো বিচারের আওতায় আনা হবে।” অতএব, আমার কথা বলার কারণ কী? বাস্তবে যা কাছে টানে তা একটিমাত্র বস্তু, কিন্তু দৃশ্যতঃ তা অনেক বস্তু মনে হয়। আমাদের ধ্বাস করে রেখেছে একশ কিসিমের কামনা-বাসনা। আমরা বলি, ‘আমি সেমাই চাই’; ‘আমি সিঙ্গারা-সমুচ্চ চাই’; ‘আমি হালুয়া চাই’; ‘আমি পিঠা চাই’; ‘আমি ফল-মূল চাই’; ‘আমি খেজুর চাই’। আমরা এগুলো এক এক করে উল্লেখ করি, কিন্তু এগুলোর মূলে রয়েছে একটি বিষয়-ই; আর তা হলো ক্ষুধা। তুমি কি দেখো না কীভাবে আমাদের এই একটিমাত্র প্রয়োজন মেটানোর পরে আমরা বলি, ‘আর অন্য কোনো কিছুর দরকার নেই?’ সুতরাং দশ কিংবা একশ বস্তু নয়, বরং একটি বিষয়-ই আমাদেরকে কাছে টেনেছিল।

“আর তাদের সংখ্যা আমরা শুধু এক পরীক্ষা হিসেবে রেখেছি।”

এই দুনিয়ার অনেক বস্তু-ই আল্লাহত্তা'লার প্রদত্ত পরীক্ষাস্বরূপ বিদ্যমান। কেননা, সেগুলো ওই একটিমাত্র বাস্তবতাকে

লুকিয়ে রেখেছে। প্রবাদ আছে, দরবেশ একজন, কিন্তু মানুষ এক'শ জন। এর মানে দরবেশের সম্পূর্ণ মনোযোগ এক সত্যের প্রতি, আর মানুষেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে এক'শটি বাহ্যিক আবরণে। কিন্তু কোন এক'শটি? কোন পঞ্চাশটি? কোন ষাটটি? আয়নার প্রতিবিষ্ঠের এই দুনিয়াতে নিজেদের হারিয়ে তারা চেহারা ও হাতপাহীন, মস্তিষ্ক ও আত্মাবিহীন মানব, যারা যাদুকরি তাবিজ-কবচের মতো, পারদের মতো কাঁপছে। তারা জানে না তারা কারা। তাদেরকে ষাট বা এক'শ অথবা এক হাজার জনই বলো, আর (এর মোকাবেলায়) দরবেশ একজন; এ দৃশ্য আপনাআপনি এক পরীক্ষা নয় কি? কেননা, সত্য হলো ওই শত শত কিছুই নয়, একদম শূন্য, আর ওই দরবেশ (একাই) এক সহস্র, এবং এক লক্ষ, এবং লক্ষ লক্ষ। একবার এক রাজা (সেনাবাহিনীর) কোনো এক সৈন্যকে এক'শ সৈন্যের খাদ্য-রসদ দান করেন। এতে সেনাবাহিনী প্রতিবাদ করে, কিন্তু রাজা চুপ করে থাকেন। যেদিন যুদ্ধের সময় উপস্থিত হয়, সেদিন সব সৈন্য ময়দান ছেড়ে পালায়; শুধু ওই একজন সৈন্য একাই লড়াই করে যায়। অতঃপর রাজা বলেন, “দেখেছো, এ জন্যেই আমি ওই একমাত্র সৈন্যকে এক'শ জনের খাদ্য-রসদ বরাদ্দ করেছিলাম।”

আমাদের সমস্ত পক্ষপাত ত্যাগ করে খোদাতা'লার কোনো ওলী (বন্ধু)-কে খুঁজে বের করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তবে আমাদের সারা জীবন পার্থক্য বুঝতে অক্ষম লোকদের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করার দরুণ আমাদের নিজেদেরই পার্থক্য বোঝার সামর্থ্য কমে যায়, আর ওই প্রকৃত বন্ধু অচেনা অবস্থায়ই পাশ দিয়ে আমাদের অতিক্রম করে যান।

পার্থক্য বোঝার সামর্থ্য এমন-ই এক গুণ যা প্রত্যেক মানুষের মাঝে লুকায়িত আছে। তুমি কি দেখো না একজন উন্নাদ হাত-পা থাকা সত্ত্বেও এই পার্থক্য করার গুণ হতে বাধিত? পার্থক্য বোঝা তোমারই অন্তঃস্থিত একটি সূক্ষ্ম মৌলিক গুণ। অথচ তুমি দিন-রাত সেই শারীরিক আকৃতির প্রতিপালনে নিমগ্ন, যা সঠিক ও ভুলের পার্থক্য বুঝতেই অক্ষম। তুমি কেন এই শারীরিক আকৃতির সেবায় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছো এবং ওই সূক্ষ্ম মৌলিক গুণের প্রতি পুরোপুরি অবহেলা দেখিয়েছ? ওই গুণের বলেই শরীর অস্তিত্বশীল, কিন্তু ওই গুণ কোনোভাবেই শারীরিক আকৃতির ওপর নির্ভরশীল নয়।

চোখ ও কানের জানালা দিয়ে যে আলো আপন প্রভা ছড়ায়, সেসব জানালার অস্তিত্ব না থাকলেও আলোর প্রভা তাতে থেমে থাকবে না। সেটি অন্য জানালা খুঁজে নেবে কিরণ ছড়াবার জন্যে। তুমি যদি সূর্যের সামনে একটি প্রদীপ নিয়ে

আসো, তবে তুমি কি এ কথা বলবে, ‘আমি প্রদীপের সাহায্যে সূর্যকে দেখি?’ আল্লাহ মাফ করুন! তুমি প্রদীপ না আনলেও সূর্য তার কিরণ ছড়াতোই। তাহলে প্রদীপের কী-ই বা প্রয়োজন?

রাজা-বাদশাহদের সাথে সংশ্রব রাখার বিপদ এটি-ই। বিষয়টি এই নয় যে তুমি তোমার প্রাণ হারাতে পারো -আজ হোক বা কাল হোক, আমাদের তো যে কোনোভাবে জীবনাবসান হবেই -তাতে কিছু এসে যায় না। বিপদ দেখা দেয় তখন-ই, রাজা-বাদশাহবর্গ যখন দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয় এবং তাদের প্রভাবের সম্মোহনীশক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর তা বড় এক প্রদীপে রূপ নেয়, ওই সময় যে ব্যক্তি তাদের সাথে সংশ্রব রাখে, তাদের সাথে বন্ধুত্বের দাবি করে এবং তাদের কাছ থেকে টাকাপয়সা নেয়, সে অবধারিতভাবে তাদের খায়েশ অনুযায়ী-ই কথা বলে। ওই ব্যক্তি রাজা-বাদশাহদের দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণের সমস্ত কথাবার্তা পুরো মনোযোগসহ শুনতে বাধ্য থাকে এবং তা অস্বীকার বা অমান্য করতেও অক্ষম হয়।

আর সেখানেই বিপদ ওঁত পেতে আছে; এর দরুণ প্রকৃত উৎসের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে যেতে থাকে। তুমি (অন্তরে) রাজা-বাদশাহদের প্রতি আগ্রহ লালন করলে আধ্যাত্মিক জীবনের মৌলিক পূর্বশর্ত যে অপর আগ্রহটি, তা তোমার কাছে অপরিচিত হয়ে যায়। রাজা-বাদশাহদের পথ ধরে তুমি যতো এগোবে, ততোই মাশুক তথা প্রেমাস্পদ (মানে খোদাতা'লা) যে রাজে অবস্থান করেন, তার গতিপথ বা গন্তব্যের ঠিকানা হারিয়ে যেতে থাকে। দুনিয়াদার লোকের সাথে যতো সখ্যতা তুমি গড়ে তোলো, ততোই মাশুক তোমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। আহলে দুনিয়া তথা দুনিয়াওয়ালাদের দিকে পথ ধরা মানে তাদের শাসনের অধীনে তোমার চলে যাওয়া। একবার তুমি তাদের পথ ধরলে শেষমেশ খোদাতা'লা তাদেরকে তোমার ওপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা প্রদান করেন।

মহাসমুদ্রে পৌঁছে এক ছোট কলসভর্তি জলে সন্তুষ্ট থাকা সত্যি পরিতাপের বিষয়। সমুদ্রে তো রয়েছে মণি-মুক্তো ও নানা ধরনের মূল্যবান বস্তু। এমতাবস্থায় শুধু (কলসে) পানি নেয়ার মূল্য কতোখানি? বুদ্ধিমান মানুষদের জন্যে এটি কতোটুকু গর্বের বিষয় হতে পারে? এই দুনিয়াটি হলো প্রকৃত সাগরের মাঝে এক বিন্দু জল মাত্র। ওই মহাসাগর সূক্ষ্মী সাধক/দরবেশদেরই বিদ্যা, আর ওর জলরাশির (গভীরে) রয়েছে খোদ মুক্তোটি (মানে খোদাতা'লা)।

এই পৃথিবী শুধু ফেনিল জলরাশি, যা (জাহাজ থেকে ভার কমানোর জন্যে ফেলে দেয়া মূল্যহীন) ভাসমান বজের্জ পূর্ণ। তথাপি ঘূর্ণীয়মান ও প্রবহমান ছন্দময় উর্মিমালার প্রভাবে এ ফেনিল জলরাশি এক সুনির্দিষ্ট সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু এই সৌন্দর্য তো অন্য কোথাও থেকে ধার করা কোনো বস্তু। এটি একটি জাল মুদ্রা যা দেখতে জলজ্ঞল করে।

মানুষ হলো খোদাতা'লার এক দূরবীন; কিন্তু দূরবীন ব্যবহারের জন্যে প্রয়োজন কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞানীর। ওই দূরবীন যদি কোনো সজি-তরকারি বিক্রেতা বা মুদি দোকানী পায়, এতে তাদের কী ফায়দা হবে? তারা কি সেটি দ্বারা ঘূর্ণীয়মান তারকারাজির কক্ষপথ বা গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান কিংবা সেগুলোর প্রভাব ও অন্যান্য বৃত্তান্ত জানতে সক্ষম হবে? কেবল একজন জ্যোতির্বেত্তার হাতেই ওই দূরবীন তার প্রকৃত মূল্য খুঁজে পাবে।

এই তাত্ত্বিক দূরবীন যেমন আসমানের গ্রহ-নক্ষত্রের চলাচল আয়নার মতো প্রতিফলন করে, তেমনি মানব-ও খোদাতা'লার এক দূরবীন বটে।

“আমরা আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি।”

যে সকল পুণ্যাত্মা বাস্তবতা দর্শনে ও নিজ নিজ সন্তার দূরবীন দ্বারা গ্রীষ্মী রীতিনীতি শিক্ষায় খোদাতা'লা কর্তৃক পরিচালিত হয়েছেন, তাঁরা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, প্রতি ঝলকে ঝলকে খোদার গ্রীষ্মী বিধান প্রত্যক্ষ করে থাকেন। সত্য বটে, এটি এমনই এক অসীম সৌন্দর্য যা তাঁদের আয়নায় প্রতিফলিত হয় নিরবধি।

আল্লাহতা'লার বান্দা-মঙ্গলী নিজেদেরকে এক (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও সুষমার আবরণে ঢেকে রাখেন যা অন্যদের চোখের আড়ালে থেকে যায়। এ সকল বান্দা মাত্রাতিরিক্ত গ্রীষ্মপ্রেমের কারণে বা তা হারানোর শক্ষায় নিজেদেরকে ছান্দাবরণে (লোকচক্ষুর) আড়াল করে রাখেন, যেমনটি (কবি) মোতানাবী সুন্দরী নারীদের সম্পর্কে বলেন:

“নারীকুল পরিধান করে অলঙ্কৃত রেশমের বসন,
নয়কো তা সৌন্দর্যচর্চার ভূষণ,
বরঞ্চ কামুক নয়ন হতে নিজ সৌন্দর্যেরই সুরক্ষণ।”

উপদেশ বাণী-৩

আমীর (পারসিক শাসক যিনি মওলানা রূমীর দরবারি মজলিশে উপস্থিত ছিলেন, তিনি) বলেন: “আমার রূহ (আত্মা) রাত-দিন খোদাতা'লার খেদমতে অতিবাহিত করার

নিয়ত (অভিপ্রায়) রাখে, কিন্তু মোংগল-সম্পর্কিত বিষয়গুলোর দায়িত্ব থাকায় সে ধরনের (দীনী) খেদমতের সময় আমার হাতে নেই।”

মওলানা রূমী (রহ:) জবাব দেন: (আপনার) ওই ধরনের কাজ-ও খোদাতা'লার খেদমতসূচক। কেননা আপনার দেশের জন্যে তা শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের উপায়। আপনি নিজেকে, আপনার মালিকানাধীন সহায়-সম্পদ ও আপনার সময়কে উৎসর্গ করছেন যাতে কিছু মানুষের অন্তর শান্তিপূর্ণভাবে আল্লাহর ইরাদা (গ্রীষ্মী ইচ্ছা) মান্য করার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। অতএব, এটিও উত্তম (নেক) কর্ম। খোদা পাক আপনাকে এ ধরনের নেক কর্মে প্রবৃত্ত করেছেন এবং আপনি যা করেন তার প্রতি আপনার প্রচণ্ড ভালোবাসা খোদাতা'লার আশীর্বাদেরই প্রমাণ বহন করে। তবে আপনার কাজের প্রতি এ মহৱত যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে তা হবে ওই আশীর্বাদ অস্থিরারেই একটি আলামত বা চিহ্ন। কেননা খোদাতা'লা শুধু লায়েক বা যোগ্যদেরকেই ওই সব সঠিক মনোভাব (তথা আচরণ) গ্রহণের দিকে পরিচালনা করেন যা দ্বারা আধ্যাত্মিক পুরুষার অর্জন করা যাবে।

উষ্ণস্নানের (হামামের) কথাই ধরা যাক। এর তাপ আসে শুকনো খড়, জ্বালানি কাঠ, গোবর সারের মতো জ্বালানি থেকে। একই ভাবে খোদাতা'লাও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মন্দ ও অগ্রীতিকর কিন্তু বাস্তবে পবিত্রতা ও নির্মলতার মাধ্যম এমন বিষয় বা বস্তু ব্যবহার করে থাকেন। ওই স্নানের (জ্বালানির) দৃষ্টান্তের মতোই পুরুষ বা নারী (নেক) কর্মোদ্যম লাভ করে পবিত্র হন এবং সকল মানবজাতির জন্যেও উপকারী হয়ে ওঠেন।

(এ পর্যায়ে মওলানার দরবারে কয়েকজন বন্ধুর আগমন হয়; তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বলেন): আমি যদি আপনাদের প্রতি খেদমতগ্রাহ না হই এবং আপনাদের স্বাগত না জানাই বা কুশল জিজ্ঞেস না করি, তাহলে এটি সত্য শুন্দা প্রদর্শনের একটি চিহ্ন হবে। এই পরিস্থিতিতে শুন্দাই যথাযথ। কেউ প্রার্থনারত হলে তার উচিত নয় তার বাবা বা ভাইকে স্বাগত জানানোর জন্যে তা (প্রার্থনা) বন্ধ করা। প্রার্থনায় মনোনিবিষ্ট থাকার সময় বন্ধদের প্রতি অমনোযোগী হওয়া সর্বোচ্চ স্তরের শুন্দা প্রদর্শন এবং শ্রেষ্ঠতম সৌজন্য; কেননা ওই ব্যক্তি প্রিয়জনের খাতিরে খোদাতা'লার ধ্যান থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। এতে (ধ্যানভঙ্গের কারণে) খোদায়ী গ্যব থেকে প্রিয়জনেরা রেহাই পান। অতএব, প্রকৃত শুন্দা কোনো সামাজিক

কুশলাদির মধ্যে নিহিত নয়, বরং তা অন্যদের আধ্যাত্মিক মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। কেউ একজন জিজ্ঞেস করেন: “খোদার সান্নিধ্য লাভে ইবাদত-বন্দেগীর চেয়েও শ্রেয় কোনো পথ্য আছে কি?”

মওলানা রূমী (রহঃ) জবাব দেন: হ্যাঁ, কিন্তু তাও ইবাদত (প্রার্থনা)। এটি বাহ্যিক আকৃতিবিহীন (মানে অনানুষ্ঠানিক) বন্দেগী। এই বাহ্যিক আকৃতির প্রার্থনা হলো ইবাদতের শরীর মাত্র, কেননা তাতে একটি সূচনা ও পরিসমাপ্তি বিদ্যমান। সূচনা ও পরিসমাপ্তিবিশিষ্ট সকল বস্তু-ই একেকটি দেহ। সকল কথা ও আওয়াজেরই একটি শুরু ও একটি শেষ আছে, আর তাই সেগুলো একেকটি আকৃতি ও দেহ। কিন্তু ইবাদত (প্রার্থনা)-এর অন্তঃঙ্গিত আত্মা হলো নিঃশর্ত ও অসীম; আর তাতে নেই কোনো সূচনা কিংবা পরিসমাপ্তি।

মহানবী (দঃ) যিনি মুসলমানদের নামাযের বিধানদাতা, তিনি বলেন, “খোদাতা’লার কাছে আমার প্রার্থনার এমন এক মুহূর্ত বা ক্ষণ আছে যা অন্য কোনো নবী (আঃ) ধারণ করেন না, আর যা খোদার পরে (মর্যাদাশীল) কোনো ফেরেশ্তার দ্বারাও সীমিত নয়।” তাই এতে আমরা উপলক্ষ্য করতে পারি প্রার্থনার আত্মা কেবল ইবাদতের বাহ্যিক আকৃতি নয়। বরঞ্চ তা সম্পূর্ণ নিবিষ্টতা, যা এমনই এক হাল বা আধ্যাত্মিক অবস্থা যেখানে এসব বাহ্যিক আকৃতির কোনো স্থান নেই। স্বয়ং জিবরীল আমীন (আঃ) যিনি নির্খুঁত এক বাস্তবতা, তাঁকেও সেখানে (মিরাজে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হালত অবস্থায়) খুঁজে পাওয়া যায় না।

বর্ণিত আছে যে একদিন আমার বাবার বন্ধুরা তাঁকে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। নামাযের সময় হলে পরে (বাবার) এই সকল বন্ধু তাঁকে ডেকে বলেন, “নামাযের সময় হয়েছে।” আমার বাবা তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করলে তাঁরা ওঠে দাঁড়িয়ে নামাযে রত হন। তবে দু’জন বন্ধু বাবার সাথে থেকে যান এবং তাঁরা নামাযে দাঁড়াননি।

নামাযে দণ্ডয়মান বন্ধুদের একজনের নাম ছিল খাওয়াজা-জি। তাঁর অন্তঃচক্ষু দ্বারা তাঁকে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়, যারা নামাযে রত হয়েছিলেন তাঁরা মহানবী (দঃ)-এর পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের পিঠ ছিল মক্কা শরীফের দিকে। অপরদিকে, আমার বাবার সাথে অবস্থানকারী দু’জন মক্কা শরীফ-মুখি ছিলেন। যেহেতু আমার বাবা ‘মাস্তি’ তথা আত্মহারা এক অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন এবং নিজ সন্তার লয় সাধন করেছিলেন, আর তিনি খোদার নূরে (জ্যোতিতে) মিশেও গিয়েছিলেন, সেহেতু তিনি মওলার নূরে পরিণত হন।

খোদাতা’লার নূর তথা জ্যোতির দিকে যে কেউ পিঠ দিয়ে দাঁড়ালে এবং নিজেদের নামাযের কেবলা-মুখি দেয়ালের দিকে মুখ ফেরালে সে নিশ্চিতভাবে মক্কা শরীফের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়। কেননা, খোদার নূর হলো মক্কা-মুখি কেবলার রূহ বা আত্ম।

রাসূলুল্লাহ (দঃ) একবার জনেক বন্ধুকে তিরক্ষার করে বলেন, “আমি তোমাকে ডেকেছিলাম; তুমি এলে না কেন?” ওই বন্ধু উত্তর দেন, “আমি নামাযে রত ছিলাম।” মহানবী (দঃ) বলেন, “আমি কি তোমাকে আল্লাহতা’লার খাতিরেই ডাকিনি?” এমতাবস্থায় ওই বন্ধু উত্তর দেন, “আমি অসহায়।”

প্রতিটি মুহূর্তে অসহায় অনুভব করা, সাফল্য ও তার পাশাপাশি ব্যর্থতায় তোমাকে অসহায় দেখতে পাওয়া অতি উত্তম একটি বিষয়। কেননা, তোমার সামর্থ্যের চেয়েও অধিকতর সামর্থ্যবান একজন (মানে খোদাতা’লা) আছেন; আর প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমার ইচ্ছা তাঁরই বৃহত্তর ইচ্ছার অধীন। ক্ষণে সামর্থ্যবান ক্ষণে অসহায়, এ দুটো ভাগে তুমি কিন্তু বিভক্ত নও। তুমি সবসময়ই অসহায়, কেবল কখনো মনে রাখতে পারো, কখনো পারো না। যখন স্মরণ করতে পারো, তখন ওই মুহূর্তের কেন্দ্রবিন্দু দৃশ্যমান হয়। এমতাবস্থায় তোমার সামনে পথটি খুলে যায়। সত্য বটে, আমাদের অবস্থা কী-ই বা আর হতে পারে যখন দেখি সিংহ, বাঘ ও কুমির সবাই অসহায় এবং খোদার সামনে (ভয়ে) কম্পমান? এমন কী আসমান ও জমিন-ও অসহায় এবং তাঁর-ই ডিক্রি তথা বিধানের অধীন।

খোদাতা’লা এক মহাপরাক্রমশালী বাদশাহ। তাঁর নূর (জ্যোতি) চাঁদ কিংবা সূর্যের আলো নয়, যে ক্ষেত্রে এগুলোর কোনো না কোনো আকৃতি বিদ্যমান। খোদার নূর যখন উন্মুক্ত আলো ছড়ায়, তখন আসমান কিংবা জমিন অবশিষ্ট থাকে না; সূর্য বা চাঁদও অবশিষ্ট থাকে না। কিছুই অবশিষ্ট থাকে না একমাত্র ওই মহা বাস্তবতা ছাড়া।

কোনো এক রাজা এক দরবেশকে বলেন, “আল্লাহর দরবারে আপনি যখন প্রকাশিত হবেন ও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করবেন, তখন আমার কথা স্মরণ করবেন।” এ কথার জবাবে দরবেশ বলেন, “আমি যখন ওই দরবারে হাজির হবো এবং দিবাকররূপী খোদা তাঁর ওই নূর আমার প্রতি বিচ্ছুরণ করবেন, আমি তখন নিজেকেই মনে রাখতে পারবো না। এমতাবস্থায় আপনাকে কীভাবে মনে রাখা সম্ভব হবে আমার?”

তবু তুমি ওই ধরনের পুরো মাত্রায় নিবিষ্ট কোনো দরবেশের কাছে অনুরোধ করবে; কেননা তাঁরা খোদার দরবারে হাজির হয়ে এমন কী তোমার কথা বা তোমার চাহিদার কথা উল্লেখ না করা সত্ত্বেও অনুরোধটি পূরণ হয়ে যাবে।

এককালে এক রাজার প্রিয়ভাজন ও অত্যন্ত আস্থাশীল একজন সেবক ছিলেন। ওই সেবক রাজ প্রাসাদের দিকে রওয়ানা হলেই মানুষেরা তাঁর কাছে নিজেদের বৃত্তান্ত ও চিঠিপত্র জমা দিয়ে সেগুলো রাজার বরাবরে পেশ করার মিনতি জানাতো। তিনি তাঁর থলেতে সেসব কাগজপত্র রাখতেন। অতঃপর রাজার সামনে হাজির হলে তিনি তাঁর (রাজকীয়) সৌন্দর্য দর্শনে নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন এবং কিংকর্তব্যবিমুচ্ছ হয়ে যেতেন। এমতাবস্থায় রাজা স্নেহভরে তাঁর থলেতে হাত চুকিয়ে বলতেন, “আমার (রাজকীয়) সৌন্দর্য দর্শনে নিবিষ্ট আমারই এ সেবক এই থলের ভেতরে কী রেখেছে?”

এ উপায়ে রাজা মহাশয় প্রজাদের চিঠিপত্র পেয়ে যেতেন এবং প্রত্যেক নর ও নারী প্রজার আবেদনপত্রে মঙ্গলসূচক স্বাক্ষর করে সেগুলো আবার থলেতে রেখে দিতেন। ফলে ওই সেবকের দ্বারা প্রজাদের আবেদনপত্র জমা দেয়া ছাড়াই রাজা মহাশয় প্রজাদের প্রত্যেকের চাহিদা পূরণ করতেন; আর এতে কোনো আবেদন-ই নাকচ হতো না। পক্ষান্তরে, তাদের চাওয়ার বহু গুণ বেশি তারা পেতো। কিন্তু (রাজার সৌন্দর্য দর্শনে) সজ্ঞানতা বা চেতনা বজায় রাখতে সক্ষম এবং সাহায্যপ্রার্থী প্রজাদের বৃত্তান্ত রাজার সামনে পেশ করতে পারঙ্গম অন্যান্য সেবকদের বেলায় একশটি অনুরূপ আবেদনপত্রের মধ্যে হয়তো একটিমাত্র মঙ্গল হতো।

উপদেশ বাণী-৪

কেউ একজন বলেন: “আমি কী যেন ভুলে গিয়েছি।”

মওলানা রূমী (রহ:) উত্তর দেন: পৃথিবীতে একটি জিনিস কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বাকি সব কিছু যদি তুমি ভুলেও যাও কিন্তু ওই বিষয়টি না ভোলো, তাহলে তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ-ই নেই। পক্ষান্তরে, তুমি যদি সমস্ত কিছু মনে রেখে যথাযথভাবে পালন করো কিন্তু ওই বিষয়টি-ই ভুলে যাও, তবে তোমার সবই পঞ্চম।

এটি যেন কোনো রাজা তোমাকে একটি সুনির্দিষ্ট দায়িত্বভার অর্পণ করে কোনো দেশে পাঠিয়েছেন। তুমি সেখানে যেয়ে ১০০টি অন্য কাজ সম্পন্ন করলে কিন্তু ওই সুনির্দিষ্ট কাজটি পালন করলে না; এমতাবস্থায় তুমি কিছুই করো নি বলে সাব্যস্ত হবে। অতএব, এ দুনিয়ায় প্রত্যেকেই কোনো না

কোনো বিশেষ কাজের দায়িত্ব নিয়ে আবির্ভূত হয়, আর সেটি-ই তাদের উদ্দেশ্য। তারা তা না করলে কিছুই করেনি বলে সাব্যস্ত হবে।

সকল বস্তুকেই একেকটি দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছে। আসমানের কর্তব্য বৃষ্টি বর্ষণ ও আলো দান করা, যাতে জমিনে উড়িদ জীবন লাভ করে। পৃথিবীর মাটি বীজ গ্রহণ করে ফল-ফসল উৎপন্ন করে; এটি আরও লক্ষটি চমকপ্রদ বস্তু গ্রহণ করে তা প্রকাশ করে থাকে, যা এতো গণনাতীত যে বলার মতো নয়। পাহাড়-পর্বত দান করে স্বর্ণ ও রূপার খনি। এই যে আসমান, জমিন ও পাহাড়-পর্বত এতোগুলো কাজ করে, তারা কিন্তু ওই একটিমাত্র বিশেষ কাজ করে না যা আমরা তথা মনুষ্যকুল করে থাকি।

“আমরা আস্থার ভার অর্পণ করেছিলাম আসমান, জমিন ও পাহাড়ের ওপর, তারা তা বহনে অস্থীকৃতি জানায় এবং এ দায়িত্বের ভয়ে ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত, কিন্তু মানবজাতি তা বহন করে, নিশ্চয় তারা নির্বোধ ও পাপী।” অতএব, মানুষদেরকে একটি (সুনির্দিষ্ট) কাজ দেয়া হয়েছে, আর যখন তা তারা যথাযথভাবে পালন করে, তাদের সমস্ত পাপ মোচন হয় ও নির্বান্ধিতার দায় ঘুচে যায়।

তুমি যুক্তি দেখিয়ে থাকো, “আমি যে কাজগুলো সম্পন্ন করেছি সেগুলোর দিকে একবার দেখুন, যদিও আমি ওই সুনির্দিষ্ট দায়িত্বটি পালন করতে পারিনি।” কিন্তু বৎস, তোমাকে তো ওই সমস্ত কাজের জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি! এ যেন তোমাকে একখানা অমূল্য ভারতীয় ইস্পাতের তরবারি দেয়া হয়েছে, যেটি রাজা-বাদশাহদের কোষাগারে পাওয়া যায়, আর তুমি সেটি কসাইয়ের ছুরির মতো পচা গোস্ত কাটার কাজে ব্যবহার করছো এ অজুহাত দেখিয়ে, “আমি এ তরবারিকে অলস ফেলে রাখিনি, বরং নানা উপকারী কাজে ব্যবহার করছি।” কিংবা এ যেন একটি খাঁটি স্বর্ণের পাত্রে শালগাম রাখা করা, যেখানে ওই স্বর্ণের একেকটি কণা দ্বারাই একশটি পাত্র কেনা যায়। অথবা, এ যেন গরম ও ঠাণ্ডা করে পান দেয়া সেরা লোহার তৈরি একখানা দামেশ্বীয় ছুরি তুমি একটি দ্বিখণ্ডিত লাউয়ের খোলসকে (দেয়ালে) ঝোলানোর কাজে ব্যবহার করছো এই অজুহাত দেখিয়ে, “আমি তো এর সম্বৰহার-ই করছি। এতে একটি লাউয়ের খোলস ঝুলিয়েছি। এই ছুরিকে নষ্ট হতে দেইনি।” কী নির্বান্ধিতা-ই না হবে এ কাজটি! ওই লাউ কোনো কাঠের বা লোহার পেরেক দিয়ে ভালভাবে ঝোলানো যায়, আর ওই পেরেক কয়েক পয়সা হবে মাত্র; তাহলে কেন একশ টাকা মূল্যের ছুরি এ কাজে

ব্যবহার করা?

এক কবি একবার বলেন:

“আসমান ও জমিন হতে তুমি বেশি দামী,
এর বেশি কী-ই বা আর বলবো আমি,
তোমার আসল মূল্য-ই জানো না তুমি।” [নোট: মানবজাতি
সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন]

খোদাতা'লা বলেন, “আমি তোমাদের কিনে নেবো...
তোমাদের মুহূর্তগুলো, তোমাদের নিঃশ্঵াসগুলো, তোমাদের
মালামাল, তোমাদের জীবনগুলো। তোমরা সেগুলো আমার
উদ্দেশ্যে ব্যয় করো; আমার কাছে হস্তান্তর করো; আর
সেগুলোর (বিনিময়-) মূল্য হবে ঐশী মুক্তি, করণা ও জ্ঞান-
প্রজ্ঞা। আমার দৃষ্টিতে এটি-ই তোমাদের মূল্য।” কিন্তু আমরা
যদি আমাদের জন্যেই আমাদের জীবনকে সীমিত রাখি,
তাহলে (খোদায়ী) মঞ্চুরিকৃত ওই অমূল্য রতন আমরা হারিয়ে
ফেলবো। লাউয়ের খোলস বোলাতে এক'শ টাকা মূল্যের
দামী ছোরা দেয়ালে বিন্দুকারী সেই লোকের মতো সেগুলোর
মহামূল্য-ও একটি পেরেকের দামে নেমে আসবে।

তবু তুমি আরেকটি অজুহাত দেখাও এ কথা বলে, “কিন্তু
আমি তো মহা মহা কাজে আত্মনিয়োজিত। আমি আইনশাস্ত্র,
দর্শনবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র ও
অন্যান্য বিদ্যাচর্চা করছি।” উভয়, কিন্তু তোমার নিজের স্বার্থ
ছাড়া কার খাতিরে তুমি সেগুলো অধ্যয়ন করছো? তা যদি
হয়ে থাকে আইনশাস্ত্র, তবে তুমি তা অধ্যয়ন করছো যাতে
কেউ তোমার কাছ থেকে রুটির টুকরো চুরি করতে না পারে,
বা কাপড়-চোপড় ছিনিয়ে নিতে না পারে, অথবা তোমাকে
খুন করতে না পারে। সংক্ষেপে, এটি তোমার নিজস্ব
নিরাপত্তার খাতিরেই তুমি করছো। বিষয়টি যদি হয়ে থাকে
জ্যোতির্বিদ্যা, তবে তা বলয়গুলোর বিভিন্ন পর্যায় ও পৃথিবীর
ওপর সেগুলোর প্রভাব, সেগুলো হাঙ্কা না ভারী, শান্তি না
বিপদের সঙ্কেতবাহী, এ সমস্ত বিষয়-ই তোমার নিজস্ব
পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট; যা নিতান্তই তোমার স্বার্থসংশ্লিষ্ট।
আর অধ্যয়নের বিষয়টি যদি হয় চিকিৎসাশাস্ত্র, তবে তা-ও
তোমার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট। এ ব্যাপারে তুমি
যথাযথ বিবেচনা করলে দেখবে তোমার সমস্ত বিদ্যাচর্চার মূল
হচ্ছে তুমি। ওই সকল মহা মহা কাজ কিন্তু তোমারই শাখা-
প্রশাখা।

এসব (অধ্যয়নের) বিষয় যদি এতো এতো বিস্ময় ও অন্তহীন
জ্ঞানে পূর্ণ ভুবন হয়, তাহলে মূল শেকড়সূচক যেসব ভুবন
তুমি (ডিঙিয়ে) অতিক্রম করছো সেগুলোর ব্যাপারে চিন্তা

করো! যদি তোমার জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা তাদের নিয়ম-
কানুন, তাদের ওষুধ-পথ্য, তাদের ইতিহাসসমূক্ষ হতো,
তাহলে তোমার ভেতর উৎসম্বরূপ যা যা ঘটতো সে সম্পর্কে
ভেবে দেখো; যে আধ্যাত্মিক নিয়ম ও দাওয়াই তোমার
আত্মিক ভবিষ্যত ও তাকদীর তথা ভাগ্যের ওপর প্রভাব
ফেলতো, তোমারই অন্তরের (অভ্যন্তরীন) সংগ্রামকে যে
ইতিহাস বর্ণনা করতো, সে সম্পর্কেও ভেবে দেখো!

রুহ তথা আত্মার জন্যে খাওয়া ও শুমোনোর খোরাকের
বাইরেও অন্য খোরাক রয়েছে। কিন্তু তুমি তো সেই
খোরাকের কথা ভুলে গিয়েছো। রাত-দিন তুমি তোমার
দেহের পুষ্টি (ও তুষ্টি) নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ততঃ দেহ একটি
ঘোড়াসদৃশ, আর এ জমিন (পৃথিবী) হচ্ছে তার আস্তাবল।
অশ্বটি যে খাবার গ্রহণ করে, তা কিন্তু তার আরোহী/চালকের
খাবার নয়। তুমি-ই হলে তার আরোহী, আর তোমার নিজস্ব
খাওয়া ও শুমোনো এবং আনন্দ-ফুর্তির চাহিদা রয়েছে। কিন্তু
যেহেতু প্রাণিটির আধিপত্য রয়েছে (তোমার ওপর), সেহেতু
তুমি তার আস্তাবলে পিছিয়ে পড়েছো। অনন্ত, অসীম জগতে
তোমাকে রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমারাহবুন্দের সারিতে
খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। তোমার অন্তর সেখানে থাকলেও
যেহেতু তোমার শরীর তোমার ওপর আধিপত্য বিস্তার
করেছে, সেহেতু তুমি তার শাসনাধীন এবং তার হাতে বন্দি।
লায়লা-মজনুন প্রেমকাহিনি অনুযায়ী, মজনুন যখন প্রেমাস্পদ
লায়লার বাড়ির দিকে রওয়ানা দেন, তখন সজাগ অবস্থায়
তিনি তাঁর উট সঠিক দিকেই চালাচ্ছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে
তিনি লায়লার চিন্তায় বিভোর হন এবং উটের কথা ভুলে যান,
তৎক্ষণাত তাঁর উট নিজ শাবক যে গ্রামে রাখা ছিল সেদিকে
চলতে থাকে। চেতনা ফেরা মাত্র-ই মজনুন দেখতে পান তিনি
তাঁর যাত্রায় দুই দিন পিছিয়ে গিয়েছেন। এভাবে তিনি মাস
চলার পরও তিনি তাঁর গন্তব্যের কাছে-ধারেও পৌঁছুতে
পারেননি। অবশেষে তিনি উটের পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নেমে
পড়েন এ কথা বলে, “এই উট আমার পতন ভেকে
এনেছে।” অতঃপর তিনি পায়ে হেঁটে চলেন এবং গান
গাইতে থাকেন:

“এক্ষণে পেছনে রেখে আমার উটের কামনা
সমুখে নিয়ে আমার নিজেরই বাসনা
আমাদের দু'য়ের উদ্দেশ্য দু'দিকে টানা
আমরা আর এব্যাপারে একমত না।”

একবার বোরহানউদ্দীনকে কেউ একজন সম্ভাষণ জানিয়ে
বলেন, “আমি বন্ধুদের মুখে আপনার অনেক প্রশংসাগীত

শুনেছি।” তিনি জবাবে বলেন, “আপনার বন্ধুরা আমার প্রশংসা করার মতো আমাকে ভালোভাবে চেনেন কি না তা দেখার জন্যে তাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তারা যদি আমাকে স্বেচ্ছার কথায় চেনেন, তাহলে তারা আমাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে চেনেন না। কেননা, কথা স্থায়ী নয়। অক্ষর ও আওয়াজ স্থায়ী নয়। এ দেহ, এ ঠেঁটিযুগল এবং এ মুখ স্থায়ী হবে না। এগুলোর সবই নেহায়েত ক্ষণিকের আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু যদি তারা (বন্ধুরা) আমাকে আমার কর্মের সুবাদে চেনেন ও জানেন, আর আমার মৌলিক সত্ত্বকেও জানেন, তাহলে আমি বুঝবো তারা আমার প্রশংসা করতে সক্ষম, আর ওই প্রশংসা-ও তার যথাযোগ্য জায়গায় পৌঁছুবে।”

এ যেন সেই নির্দিষ্ট এক রাজার কাহিনির মতো ব্যাপার। রাজা তাঁর ছেলের (বিদ্যা শিক্ষার ভার) বিজ্ঞ পণ্ডিতদের একটি দলের দায়িত্বে ন্যস্ত করেন। যথাসময়ে তারা তাকে জ্যোতিষতত্ত্ব, রেখা, সংখ্যা বা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ গণনাতত্ত্ব, আর লক্ষণ বা চিহ্ন ব্যাখ্যা করার বিদ্যাও শিক্ষা দেন; এভাবে রাজপুত্র নিরেট বোকা হওয়া সত্ত্বেও ওই সব বিষয় পুরোপুরি রং করে পণ্ডিত হয়ে যায়। একদিন রাজা মহাশয় নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে একটি আংটি নিয়ে পুত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি জিজেস করেন, “বলো তো আমার হাতের মুঠোর ভেতরে কী?” পুত্র উত্তর দেয়, “আপনার হাতে যা আছে, তা গোলাকৃতির, হলুদ রং বিশিষ্ট, খোদাইকৃত এবং ফাঁপা।” রাজা বলেন, “তুমি সমস্ত চিহ্ন-ই সঠিকভাবে ব্যক্ত করেছো, এখন বলো তো এটি কী?” রাজপুত্র জবাবে বলে, “এ নিশ্চয় চালনি।” রাজা চিংকার করে বলেন, “কী? তুমি তো সব খুঁটিনাটি বিষয়-ই জানো, যে কাউকে যা হতবুদ্ধি করবে। তাহলে তোমার এতোখানি জ্ঞানচর্চার মাঝেও চালনি যে হাতের মুঠোয় আঁটে না, এ নগণ্য বিষয়টি তোমার মন্তিক্ষের অগোচরে থেকে যাওয়াটুকু কীভাবে সম্ভব হলো?”

একইভাবে যুগের বড় বড় বিদ্যান ব্যক্তিও সকল বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান নিয়ে নিজেদের মাথার চুল নিজেরা ছিঁড়ে থাকেন। তারা ওই সমস্ত জ্ঞানের শাখা সম্পর্কে পূর্ণ ও নির্ভুলভাবে জানেন, যেগুলো কুহ তথা আত্মার সাথে সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু যে বিষয়টি সত্যিকার গুরুত্ব বহন করে এবং আমাদেরকে অন্য যে কোনো কিছুর চেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে ছুঁয়ে যায়, মানে আমাদের আপন সত্ত্বার বিষয়টি, সেটি সম্পর্কে কিন্তু তোমাদের ওই বড় বড় পণ্ডিতেরা বে-খবর ও অজ্ঞ। তারা সব বিষয়েই বলে, “এটি সত্য, ওটি অসত্য। এটি সঠিক, ওটি ভুল।” অথচ তারা নিজেদের সত্ত্বা সত্য-সঠিক না ভুল, খাঁটি-নির্মল না অপবিত্র, সে সম্পর্কে অনবধান। ফাঁপা ও হলুদবর্ণ, উৎকীর্ণ ও গোলাকার, এসব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত

হওয়াটা আসলে আকস্মিক; ওই আংটিকে আগুনে নিষ্কেপ করলে এগুলোর কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। তখন তা তার আপন সত্ত্বায় পরিণত হয়, যা সকল দৃশ্যমান আকৃতি হতে পরিশোধিত। অতএব, এটি ওই সকল পণ্ডিতের জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়; তারা যা জানে তার সাথে মৌলিক বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক-ই নেই, যে বাস্তবতা এসব ‘চিহ্ন’ (আভাস/সংক্ষেত) দূর হয়ে যাওয়ার পর একাই অস্তিত্বশীল থাকে। তারা (বিদ্বানবর্গ) জ্ঞানদীপ্ত কথা বলে, বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়, আর শেষমেশ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে রাজার হাতের মুঠোয় যা আছে তা একটি চালনি। বিষয়টির শেকড়ের জ্ঞান তথা জীবনের উদ্দেশ্য (মূল কারণ) কিন্তু তাদের জানা নেই।

আমি এক নাইটিংগেল পাখি। তারা যদি আমায় বলে, “অন্য কোনো আওয়াজ (সুর) তোলো”, আমি তা পারবো না। আমার জিহ্বা (কর্ষ) যে রকম, সে রকমই সুর ওঠবে। আমি অন্য কোনো রকম কথা বলতে পারবো না। তবে যারা পাখির গান শেখে, তারা নিজেরা কিন্তু স্বয়ং পাখি নয়। বরঞ্চ তারা পাখির শক্তি এবং তাদের আটককারী। তারা (পাখির) গান গায় ও শিস দেয় যাতে অন্যরা তাদেরকে পাখি মনে করে। তাদেরকে ভিন্ন কোনো আওয়াজ দিতে বলুন, তারা তা পারবে। কেননা সে আওয়াজটি স্বেচ্ছা তাদের ধারণকৃত। সেটি তাদের একদম নিজস্ব ধৰনি নয়। ওই পণ্ডিতবর্গের মতো তারাও অন্য গান ধরতে সক্ষম, যেহেতু তারা ওই গানগুলো ছিনতাই করতে এবং প্রতিটি বক্ষ থেকে চুরি করা পৃথক পৃথক সুরের প্রদর্শনী দিতে শিখেছে। (চলবে)

সুফি উদ্ধৃতি

- আল্লাহ তাঁর শ্রিয় বান্দাকে তিনটি স্বভাব দান করেন। যথা- (ক) সমুদ্রের মত বদান্যতা, (খ) সূর্যের ন্যায় উদারতা ও (গ) ভূতলের ন্যায় ন্যৰতা।”
- আল্লাহ যাকে যোগ্য ও উপযুক্ত করেন, তার পিছনে এক ফিরাউন লাগিয়ে দেন।”
- সৎ সাহচর্য সৎকার্য থেকে উত্তম আর কুসংসর্গ কুকার্য থেকে মন্দ।”

-হ্যরত বায়েজীদ বোন্তামী (রহঃ)

মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার রূপরেখা : তত্ত্ব ও বাস্তবতা

• ড. সেলিম জাহাঙ্গীর •

নবী আখেরুজ্জামান হ্যরত আহমদ মুজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) ঐতিহাসিকভাবে দুটো অনন্য বিশেষত্বের অধিকারী ছিলেন। (১) রহমাতুল্লিল আলামিন-সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত স্বরূপ। (২) সর্বশেষ বা আখেরী নবী।

নবী আখেরুজ্জামান হিসেবে, সর্বশেষ নবীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার কারণে নবুয়তের যুগ বন্ধ হয়ে গেলে তাঁর প্রথমোক্ত রহমাতুল্লিল আলামিনের ধারা তাঁর বেলায়তি বৈশিষ্ট্যে প্রবহমান থাকে। যা ১৪০০ বছরের অধিক সময়কাল ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে জারি রয়েছে আল্লাহর মনোনীত অলি-বুজুর্গ ও কামেল পীর মাশায়েখের মাধ্যমে।

বেলায়তের এ ধারাবাহিকতায়, স্থান কাল পাত্র ভেদে বিশের

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ মনোনীত আধ্যাত্মিক

ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক তৃরিকার (আধ্যাত্মিক

পথে চলার পথ) উভব ঘটে।

এ ধারায় ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়,

মোগল সম্রাট আকবরের শাসনামলে ভারতবর্ষের

উল্লেখযোগ্যসংখ্যক তৃরিকার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়েছে।

সম্রাট আকবরের নবরত্নের অন্যতম, ঐতিহাসিক আবুল

ফজলের ‘আইনী আকবরী’ গ্রন্থে এ রকম ১৪টি তৃরিকার

নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১

কালের বিবর্তনে, সমাজ বাস্তবতায় অনেক তৃরিকার কার্যক্রম

সীমিত, আবার কিছুসংখ্যক তৃরিকার প্রচার-প্রসার ঘটেছে দৃষ্টি

আকর্ষণীয়ভাবে। এই প্রেক্ষাপটে শত শত বছরের আধ্যাত্মিক

পথ পরিক্রমায় এ ভূখণ্ডে চারটি তৃরিকা বিশেষভাবে পরিচিত

এবং প্রসারিত হয়েছে। এগুলো হলোঃ কাদেরিয়া, চিশ্তিয়া,

নক্ষবন্দিয়া এবং মোজাদ্দেদীয়া।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমাজ বিবর্তনের ধারায় স্থান কালপাত্র ভেদে

এক তৃরিকার সাথে অন্য তৃরিকার মিথ্যক্রিয়াও

(Interaction) ঘটেছে বিভিন্নভাবে নানা মাত্রিকতায়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মৌলিকভাবে কাদেরিয়া, চিশ্তিয়া

এবং মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমীর মৌলবীয়া তৃরিকার

মিথ্যক্রিয়ার (Interaction) বিষয়টি তাত্ত্বিক গবেষণায় উঠে

এসেছে ড. মুহম্মদ এনামুল হকের পিএইচডি থিসিসে।

পরবর্তীতে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীয়ার পৌত্র, অছিয়ে

গাউসুল আয়ম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী ১৯৬০

সালে প্রকাশিত তাঁর ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ গ্রন্থে এ তৃরিকার

তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন

বিস্তারিতভাবে। ৩

মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার তাত্ত্বিক বিশেষক ও স্বরূপ উল্লোচক

সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী এ দিগন্তি

সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে ন্যূনতম ৮টি তৃরিকার কথা উল্লেখ

করেছেন। ৪ অতঃপর এ তৃরিকাকে তুলনা করেছেন ‘মহাসাগরের’ সাথে। তাঁর ভাষায়: ত্রিবিধি বেলায়তি ধারা ও নবুয়তি ধারার সমন্বয়ে, অর্থাৎ জাহের বাতেন তালীয়ে ইরশাদীসহ শরিয়ত, তৃরিকত, হাকিকত ও মারফত প্রভাব ও সংমিশ্রণে মাইজভাণ্ডারী তৃরিকারূপ মহাসাগরের উৎপত্তি। ৫ মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার স্বরূপ উল্লোচক ও তাত্ত্বিক বিশেষক সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর ‘সুফিবাদের যুগোপযোগী বিশেষত্বগুলো যেভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, সেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে একসূত্রে গ্রথিত করলে এর রূপ রেখা দাঁড়ায় নিম্নরূপঃ

১. আশরাফুল মাখলুকাত - মানবশ্রেষ্ঠত্ব

২. তাওহীদে আদ্বিয়ান - একত্ববাদী ধর্মসাম্য

৩. আদলে মোত্লাক - বিচারসাম্য

৪. বেলায়তে মোত্লাকা - অর্গলমুক্ত ঐশ্বী প্রেমবাদ

৫. হেকমতে খিজরি - রহস্যময় কৌশল

৬. উসুলে সব'আ - সম্পূর্ণ পদ্ধতির বিশ্ব ব্যবস্থা ৬

১. মানব শ্রেষ্ঠত্ব: সমগ্র বিশ্ব রহস্যের মধ্যে অত্যাশ্চর্য এক অনবদ্য সৃষ্টি ‘মানুষ’। একদিকে অনিঃশেষিত সৃষ্টিশীলতার এক অপার সম্ভাবনার ভাণ্ডার, অন্যদিকে অবক্ষয় ও অধঃপতনের উদ্বেগজনক আশংকার এক জমাট নিকষ আঁধার ‘মানুষ’। এক কথায়, বিকাশ আর বিনাশের চিররহস্যপূর্ণ, আশ্চর্য রকম দ্বন্দ্বিক প্রক্রিয়ার এক অত্যাশ্চর্য অপূর্ব সমাহার এ মানুষ; চিরায়ত অনন্ত জিজ্ঞাসা এবং অনুশীলনের এক রহস্যপূর্ণ অভিধান-মানুষ। মহানবী (সঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে “এয়া আইয়ুহান নাছ” উল্লেখের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় বিভাজনের উর্ধ্বে সর্বজনীন এ মানব সম্প্রদায়কেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অভিষিক্ত করেছেন।

মানব শ্রেষ্ঠত্বের অনন্ত জিজ্ঞাসা ও অনুশীলনকে পবিত্র কুরআন-সুন্নার আলোকে স্থান-কাল-পাত্রের আলোকে বিচার-বিশেষণ এবং তাসাউফের আলোকে একে উপস্থাপন করার মর্যাদাপূর্ণ একান্ত দায়িত্বশীল কথাগুলো জীবনঘনিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হয়েছে মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকায়। পবিত্র হাদিসে বর্ণিত “আশরাফুল মাখলুকাত” মানুষের তাৎপর্যপূর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান হলো ‘ইনসানিয়াত’। এ ইনসানিয়াতের যথার্থ পরিপূর্ণমাত্রিক হেফায়ত, পরিচর্যা ও সৃজনশীল সংরক্ষণের উপর নির্ভরশীল মানুষের যথার্থতা। বলাবাহ্ল্য, এতেই গভীরভাবে নিহিত মানুষের ইহকালীন এবং পরকালীন সফলতা। “আশরাফুল মাখলুকাতের” পরিপূর্ণ সার্থকতায় ‘মানুষ’ তখন আর সাধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা। ‘মাটির তৈরী মানুষ’ পরিণত হয়ে উঠে রীতিমতো “নূরের

খনিতে”। মাইজভাণ্ডারীয়া তত্ত্বিকার তাত্ত্বিক বিশ্লেষক, গাউসুল আয়ম শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর ‘পৌত্র ও অছি’ সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী ‘আশরাফুল মাখলুকাত’ এর এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষত্বের চম্পুকসার বর্ণনা দিয়েছেন একান্ত জীবন ঘনিষ্ঠভাবে-

আপন চিত্তে বিভোর হলে মানুষ হয় নূরের খনি
সকল আঁধার দূর হয়ে যায়, মানুষ হয় অন্তর্যামী ॥

২. তৌহিদে আদিয়ান: একত্ববাদী ধর্ম সাম্য [পরধর্মত সহিষ্ণুতা]

পবিত্র ইসলাম ধর্মের আলোকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নবী আখেরজামান তথা শেষ জমানার নবী হিসেবে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হ্যরত মোহাম্মদ (সঃ) মৌলিকভাবে অন্যান্য নবী ও রাসুল থেকে স্বতন্ত্র। তিনি শুধু ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নন এবং মুসলমান জাতির পথ প্রদর্শক নন; তিনি হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য, সমগ্র মানবজাতির হোদায়তের জন্য প্রেরিত। তাইতো তিনি ‘রহমাতুল্লিল আলামিন’-সৃষ্টি জগতের রহমত স্বরূপ। এই মৌলিকত্বের কারণে তাঁর প্রতিতি ইসলাম ধর্মের নির্দেশিকা পবিত্র কুরআনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে পূর্বাপর সমগ্র মানবজাতির কথাই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে গভীর তাৎপর্যপূর্ণভাবে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় ধর্মসমূহের পারম্পরিক সু-সম্পর্ক এবং সাম্যের কথা বলা হয়েছে বিভিন্নভাবে, নানা মাত্রিকতায়। যেমন সূরা বাকারায় বলা হয়েছে : যারা খোদা বিশ্বাসী তাঁরা ইহুদী [হ্যরত মুসা আঃ এর অনুসারী], নাসারা [খ্রিস্টান তথা ঈশা নবী অর্থাৎ যীশু খ্রিস্টের অনুসারী], সাবেয়ীন [তারকা উপাসক] যেই হউক না কেন যদি তাঁরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎ কাজ করে তাদের পুরক্ষার স্বয়ং আল্লাহর কাছে রক্ষিত আছে। তাঁদের কোন ভয়ভীতি বা অনুত্তাপ নেই। (সূরা বাকারা ৬২ আয়াত)

ধর্মসাম্য বা তৌহিদে আদিয়ানের নিকট যে সবধর্মের নৈতিক লক্ষ্যবস্তু এক এবং কোন ধর্মই যে এর নিকট নগণ্য বা হেয় নয়, পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তার সমর্থন দেয়— তোমরা কি খোদার কোন কেতাবকে বিশ্বাস এবং কোন কেতাবকে অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্যে এ রকম যারা করে তারা সংসারে অপদস্থ এবং কেয়ামতের দিন কঠোর আজাবের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে (সূরা বাকারা আয়াত ৮৫) এ প্রসঙ্গে অন্য ধর্মের প্রতি প্রচন্দ অবজ্ঞা এবং স্বীয় ধর্মের প্রতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্বারোপ করে যারা ধর্মীয় অহংকারের কারণে নিজেদের ধর্মীয় কুলীনত্ব প্রচার করে, তাদের সেই মারাত্মক ভুল ভেঙ্গে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সূরা বাকারার অন্যত্র খোদা বলছেন—
বাইবেল [ইঞ্জিল] ও তৌরাত গ্রন্থের অনুসারীরা মনে করে যে, খ্রিস্টান এবং ইহুদি ছাড়া অন্য কেহ বেহেশতে যেতে পারবে

না। ইহা তাদের মনগড়া কথা (সূরা বাকারা, আয়াত ১১)। সাথে সাথে একই সূরায় ১১২ আয়াতে এ সমস্যার সমাধান করে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে— ‘বরং ইহা সত্য যে, যে কেহ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত এবং সৎ কার্যানুরাগী হয় তার জন্য খোদার নিকট তাদের পুরক্ষার নিহিত।’

মুসলমানদের মধ্যেও অনেকের বন্ধমূল ধারণা, বেহেশ্ত শুধু মুসলমানদের জন্যই সুনির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ, অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর কোনরূপ প্রবেশাধিকার এতে নেই। অথচ মুসলমানদের ঈমান বা ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল ভিত্তির সাথে এই ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত।

মুসলমানদের ঈমান আনার অন্যতম অপরিহার্য উপাদান অবতীর্ণ কিতাবসমূহের উপর বিশ্বাস। শুধু সর্বশেষ কিতাব কুরআন শরিফ নয়, এর পূর্বে অবতীর্ণ সকল কিতাবের প্রতি অবিচল আস্থা বা প্রশ়াতীত বিশ্বাসই একজন ঈমানদার মুসলমানের বিশ্বাসের অঙ্গ।

ধর্ম সাম্যের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে সূরা আন কবুত-এ এসে। যারা উপাস্যকে বুঝতে এবং জানতে চেষ্টা করে এবং সৎ কার্যানুরাগী হয়, তারা যে কোন ধর্ম, জাতি, সম্প্রদায়ের হোক না কেন খোদাতায়ালা তাদের নিশ্চিত হোদায়ত প্রদর্শন করবেন। খোদা সৎ কার্যকারীদের সঙ্গী। (সূরা আন কবুত ৬৯ আয়াত)

ধর্ম বিরোধের বিপরীতে ধর্মসমূহের বৈচিত্র এবং পরধর্মত সহিষ্ণুতা প্রসঙ্গ

ধর্মসমূহের বৈচিত্র এবং পারম্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আলোকে পরমত সহিষ্ণুতা এবং একইসাথে নৈতিক লক্ষ্যবস্তুর আলোকে ধর্মসমূহের অনুসারীদের পারম্পরিক শুদ্ধাবোধের চৰ্চা সর্বোপরি ধর্ম সাম্যের বক্তব্য সূরা বাকারা এবং সূরা আন কবুত এ যেভাবে সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে তারই অনুরণন শুনা যায় সূরা মায়েদার ৪৮নং আয়াতে এবং সবশেষে সূরা বাকারার ১৯১নং আয়াতে—

পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদার বর্ণনা মতে, প্রত্যেকের জন্য আমি ভিন্ন ভিন্ন শরিয়াত ও ভিন্ন উন্নতির পছন্দ নির্গ঱্য করেছি। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকলকে এক উন্নতে পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহতায়ালা যা তোমাদের দান করেছেন, তার দ্বারা তোমাদের যাচাই করতে চান। অতএব, তোমরা সৎকার্যে অগ্রসর হও। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তখন আল্লাহতায়ালা তোমাদের পরম্পরের বিরোধ সম্বন্ধে সমুচ্চিত খবর দেবেন (সূরা মায়েদা, আয়াত ৪৮)

যে কোন কারণে, যে কোনভাবেই হোক না কেন, ধর্ম বিরোধে তথা ধর্মকে কেন্দ্র করে যারা পারম্পরিক ফাসাদে (বন্ধ সংঘাত) লিঙ্গ, খোদার দৃষ্টিতে তারা জঘন্য অপরাধী। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এইভাবে— ‘ফাসাদ হত্যাকাণ্ড থেকেও জঘন্য অপরাধ’

(সূরা বাকারা ১৯১ আয়াত)।

পরমত সহিষ্ণুতা এবং অহংবোধের বিপরীতে স্ব স্ব ধর্মবোধ এবং স্বীয় কর্তব্য পালনের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ থাকার বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত সূরা হজ্জ এবং সূরা হজুরাত-এ এসে-

(ক) আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের [ধর্মাবলম্বীদের] জন্য নিয়ম কানুন নির্ধারিত করে দিয়েছি যা ওরা পালন করে। সুতরাং ওরা যেন আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে বিতর্ক না করে। (সূরা হজ্জ, আয়াত; ৬৭)

(খ) হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পূরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে [ও ধর্মে] যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। (সূরা হজুরাত, আয়াত ১৩)।

আল্লাহর নির্দেশিত বিধান ‘কুরআনের’ পাশাপাশি পবিত্র হাদিস শরীফেও বিষয়টি উঠে এসেছে গভীর তাৎপর্যপূর্ণভাবে-

(ক) জিম্মদের [ইসলামী রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী] অধিকার, ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধাদি প্রদান ইসলামী রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব।

(খ) প্রতিবেশীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা মুসলমানদের পবিত্র ধর্মীয় দায়িত্ব।

৩. আদলে মোতলক: বিচারসাম্য। এখানেও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানব শ্রেষ্ঠত্বের জয়গানের অনুরূপ। যে কোন স্তরের যে কোন শ্রেণীর, যে কোন ধর্ম বর্ণের মানুষ বিচারের প্রশ্নে সমান অধিকার পাওয়ার উপযুক্ত। মানব শ্রেষ্ঠত্বের শাশ্বত সত্যটি এভাবে মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকায় সু-স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।

৪. বেলায়তে মোত্লাকা-অর্গলমুক্ত ঐশ্বী প্রেমবাদ: এক স্রষ্টায় বিশ্বাসী মানব সম্প্রদায়কে আল্লাহর পথে আহ্বান করার প্রশ্নে যাবতীয় বাধা বিপত্তিকে গৌণ ভেবে, খোদা প্রাণ্তির সহজ সরল বামেলামুক্ত পথ খোঁজে নেওয়া এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে এ ধারায় আহ্বানের এক কালোপযোগী দর্শন হলো মাইজভাণ্ডারী দর্শন। মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার প্রবর্তক ও প্রাণপূরুষ গাউসুল আয়ম শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী হিন্দু এবং বৌদ্ধ ভজনের স্ব স্ব ধর্মে রেখে আল্লাহর পথের সন্ধান দিয়েছেন, ফয়েজ রহমতে অভিষিঞ্চ করেছেন।

৫. হেকমতে খিজরী: রহস্যময় কৌশল- নবুয়তে মোহাম্মদী (দঃ) অবস্থান মতে শরিয়তি আদেশ-নিষেধমূলক ধর্ম এবং তৃরিকতি রহস্যমূলক অবস্থার সমাবেশের ফলে পূর্ণতাপ্রাপ্ত। জাহের (নবুয়ত) এবং বাতেন (বেলায়ত) খোদায়ী বিকাশধারা সমূহের মঙ্গল স্থলই খিজরী মকাম (স্থল)।

হ্যরত খিজর (আঃ) খোদার ইচ্ছা শক্তির মঙ্গল ধারক। যেহেতু এ ধারা জাহেরো (প্রকাশ্য) হৃকুম অপেক্ষা খোদার অন্তর্নিহিত ইচ্ছা শক্তিরই মঙ্গলধারক। এ ধারা জাহেরো হৃকুম অপেক্ষা খোদার ইচ্ছা শক্তিকেই অধিক প্রাধান্য দান করে, যা

খোদার নিকট প্রিয়। যেমন: পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হ্যরত খিজর (আঃ) এর আধ্যাত্মিক রহস্যপূর্ণ ঘটনাবলী যদিও হ্যরত মুসা (আঃ) এর শরিয়ত মতে আপত্তিকর এবং বোধগম্যতার উর্ধ্বে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে শরিয়তি হৃকুম অপেক্ষা হেকমত ও খোদার রহস্যময় ইচ্ছা শক্তিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এই ‘হেকমতে খিজরী’ জাত রহস্যময় কৌশল পছ্না কালের বিবর্তনে গাউসুল আয়ম শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর জীবনাদর্শ ও তদীয় তৃরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়ার প্রতিফলিত।

৬. উসুলে সাবআ বা সংকৰ্ম পদ্ধতি:

মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার প্রয়োগিক দিক মাইজভাণ্ডারী দর্শনের সাতটি ধাপ বা সিঁড়ি যা উসুলে সাবআ বা সংকৰ্ম পদ্ধতি নামে অভিহিত। যা বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থে ৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে।

১। ফানা আনিল খাল্ক বা আত্মনির্ভরতা : কারো নিকট কোনরূপ উপকারের আশা বা কামনা না থাকা। যার ফলে মানব মন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজ শক্তি সামর্থের প্রতি আস্থা জন্মে। যার ইশারায় গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী বলেছেন “নিজের হাতে পাকাইয়া থাও, পরের পাকানো থাইওনা”।

২। ফানা আনিল হাওয়া বা অনর্থ পরিহার : যা না হলে চলে, সেরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা। যার ফলে জীবনযাত্রা সহজ ও বামেলা মুক্ত হয়। যার প্রতি ইঙ্গিত করে হ্যরত আকদস বলেন- “এখানে হাওয়া (অনর্থক প্রবৃত্তিকে) দাফন করা হইয়াছে।” তাই অছি এ গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী লিখেন- “অনর্থেরই পরিহারে তাকওয়ার ঝলক দেখেছি, পরগেতে অলির পরণ পছ্না নির্দেশ দিতেছি।”

৩। ফানা আনিল এরাদা বা প্রবৃত্তি প্রসূত ইচ্ছার বিনাশ : খোদার ইচ্ছা শক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলীন করা যার ফলে সুফি মতে “তচ্ছীম ও রজা” হাসিল হয়। তার ইঙ্গিতে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী বলেন- একদিন বাড়ের সময় বাতাসে ঘর পড়ে যাচ্ছে দেখে মা [হ্যরত আকদস (কঃ) এর সম্মানিত জননী] ঘরের উত্তর দিকে ঠেস (খুঁটি) দিতে বললে, গাউচুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী দক্ষিণ দিক থেকে ঠেলতে শুরু করেন এবং মায়ের প্রশ্নের উত্তরে বলেন- উত্তর দিকে ঠেস দিলে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা হবে।

৪। মউতে আব্য্যাজ বা সাদা মৃত্যু : এটা উপবাস বা সংযমে আয়ত্ত হয় যার ফলে মানব মনে আলো বা উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। যার ইঙ্গিতে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী বলেন, “আমি বার মাস রোজা রাখি, তুমিও রাখিও। আমার ছেলেরা সারা বছর রোজা রাখে।”

৫। মউতে আসওয়াদ বা কালো মৃত্যু : এটা শক্রর শক্রতা ও নিন্দাতে হাসিল হয়। যার ইঙ্গিতে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী বলেন- “মিয়া বাহাস করিওনা, আপন হালতে

থাকিয়া যাও”। অছি এ গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী
বলেছেন— “বাক বিতন্ত পরিহারে জানার আগ্রহে”।
বাবা ভান্ডারীর অন্যতম আশেক ফকির রমেশ শীল বলে—
“শুন যত বন্ধুগণ নিন্দুকেরে তোমরা কভু ভেবোনা দুশ্মন
তারা তরিকতে ধোপার মত ধূয়ে করুক পরিষ্কার
নিন্দা করলে কী ক্ষতি আমার।”

৬। মউতে অহ্মর বা লাল মৃত্যুঃ এটা কামভাব ও লালসা
হতে মুক্তিতে হাসিল হয়। যার ইঙ্গিতে গাউসুল আয়ম
মাইজভাণ্ডারী বলেন— “করুতরের মত বাছিয়া খাও, হারাম
খাইওনা”। “নিজের হাতে পাকাইয়া খাও, পরের হাতে
পাকানো খাইওনা। আমি বার মাস রোজা রাখি, তুমিও
রাখিও” “আমার ছেলেরা বার মাস রোয়া রাখে” “দুনিয়া
মুসাফিরের জায়গা, এখানে আড়ম্বরের দরকার কি?”

৭। মউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যুঃ নির্বিলাস জীবন যাপনে
অভ্যন্ত হলে এটা হাসিল হয়। যার ফলে মানব অন্তরে স্মষ্টার
প্রেম ভালবাসা ছাড়া অন্য কামনা বাসনা থাকে না। যার
ইঙ্গিতে গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী বলেন— “ফেরেন্টা
কালেব বনিয়া যাও। নিজ সন্তান-সন্ততি নিয়া খোদার প্রশংসা
কর।” যার ইশারায় খলিফায়ে গাউসুল আয়ম হ্যরত আবদুল
হাদী কাঞ্চনপুরী লিখেন—

তোমারি প্রেমেতে মজে ইষ্ট মিত্র সবি ত্যাজে
সাধের ভূষণ করিয়াছি কলংকেরি হার
তোমারি না পাইলে আমার জীবন অসার”

রমেশ শীল বলেন—
মানুষ ধরার কল বসাইল আমার বাবা ভান্ডারী
ঐ কলেতে পরলে ধরা তার থাকে না ঘর বাড়ি”

মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার প্রবর্তক গাউসুলআয়ম মৌলভী সৈয়দ
আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর (১৮২৬-১৯০৬) জীবদ্ধায়,
৫০ বছর বয়সে তাঁর কামালিয়ত বিকাশের সূচনাপর্বে ১৮৭৬
খ্রিষ্টাব্দে কবি আহমদ আলী মিয়ার ‘বড় তুফানের কবিতায়’
চট্টগ্রামের প্রলয়ংকরী তুফানের বর্ণনা প্রসঙ্গে মাইজভাণ্ডার ও
আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর তৃপ্তীয়জনপ্রিয়তা সূচক ব্যাপক
পরিচিতির চুম্বকসার বর্ণনা পাওয়া যায় এ ভাবে—

মাইজভাণ্ডার, বিনাজুরী, কুতুবছড়ি, দমদমা-রায়পুর।

মৌলভী আহমদ উল্লাহ জান জগতে মশুর [মশহুর] ॥৭

‘জগতে মশুর’ এ অভিধার নতুনমাত্রিক অনুরণন শুনা যায়
পরবর্তীকালে কবি অমলেন্দু বিশ্বাসের গানে—

চাড়িয়ার জ্ঞানের চান্তি কভু নিভেনা/ও তার সাগর ঘেরা,
পাহাড়বেড়া পীর সন্ন্যাসীর আস্তানা।

বদরশাহ, আমানত, বায়েজিদ বোস্তাম/ মোহেছেন, গরীব
উল্লাহ, শোকর, পেটান।

আহমদ উল্লাহ ভাণ্ডারী জান, মানুষ করে দেওয়ান ॥৮

কালক্রমে এ ‘দেওয়ান’ যে শুধু চট্টগ্রাম কিংবা বঙ্গের মধ্যে

সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, দেশের সীমানা ছাপিয়ে বহিঃবিশ্বে তাঁর

ব্যাপক ও বহুল প্রচারিত জনপ্রিয়তার আরেক দৃষ্টিআকর্ষণীয়
চিত্রকৃত্ব ফুটে উঠেছে ১৯০৬ সালে তাঁর ওফাত উপলক্ষে
রচিত তদীয় খলিফা আমিনুল হক হারবাঙ্গীরী ‘ওফাতনামা’
কাব্যে—

খোদার গাউছের মৃত্যু যে জন দেখিল/অকস্মাত মুণ্ডে যেন
বজ্জাঘাত পৈল।

চট্টগ্রাম সহরে ছিল যত নরনারী/ধূলায় ধূসুরী কান্দে কুহরী-২
কলিকাতা, রেঙ্গুন, আরকান টেলিগ্রাফ খবর/হিন্দুস্থান,
বোগদাদ, মিছির, আজমীর সহর৯

গাউসুলআয়ম মাইজভাণ্ডারীর ওফাতের পর এই তৃরিকা
আরো নতুনভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে তদীয় ভাতুস্পুত্র ও
প্রধান খলিফা গাউসুল আয়ম বিল বিরাসত শাহসুফি সৈয়দ
গোলাম রহমান বাবাভাণ্ডারীর সময়কালে। বাবাভাণ্ডারীকেন্দ্রিক
মাইজভাণ্ডারের জনসম্পৃক্ততা ও জনপ্রিয়তাকে মর্যাদাপূর্ণভাবে
আমলে নিয়ে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ১৯৩৯ সালে তাঁর
দ্বিতীয় উরস শরিফ উপলক্ষে সরকারিভাবে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে
কনসেশন টিকেটে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিল। ১০

গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী ও হ্যরত বাবাভাণ্ডারীকে কেন্দ্র
করে মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার ব্যাপক গুণগত ও পরিমাণগত
আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার বিষয়টি দৃষ্টিআকর্ষণীয়ভাবে এমন
একটা পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল যে, ১৯৩২ সালে কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার প্রয়োজনে
মাইজভাণ্ডারী গানের সংগ্রহের কাজ শুরু হয় ১১ এবং একই
বছর অল ইণ্ডিয়া রেডিও কলিকাতা কেন্দ্র সর্বপ্রথম
মাইজভাণ্ডারী গান সম্প্রচারের ব্যবস্থা করে। ১২ এ সময়কালে
(১৯২৯-৩৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক
গবেষণায়ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণভাবে স্থান পায় মাইজভাণ্ডার।
স্বনামধন্য বাঙালি মণিষা, চট্টগ্রামেরই কৃতি সন্তান ডেন্টে
মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর পিএইচডি থিসিসে [History Of
Sufism In Bengal] বঙ্গে সুফিবাদের উল্লেখযোগ্য
কেন্দ্র সমূহের মধ্যে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফকে
'ফকিরদের একমাত্র জাগ্রত আড়ডাকেন্দু' হিসেবে চিহ্নিত
করেছেন তাত্ত্বিক গবেষণার সচেতন প্রয়াসে। ১৩ শুধু তাই
নয়, হাজার হাজার মাইজভাণ্ডারী গান, মাইজভাণ্ডারী উরস ও
মেলা আবহান বাঙলার লোক ঐতিহ্যে সংযোজন করেছে
তাৎপর্যপূর্ণ নতুন মাত্রিকতা।

এতগুলো সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষত্বকে ধারণকারী
মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার ইতিহাসে প্রবর্তীকালে আরো যাঁরা
অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন,
সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল, সৈয়দ দেলাওর হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী, সৈয়দ শামসুল হুদা মাইজভাণ্ডারী এবং সৈয়দ
জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী। তাঁরা জন্মসূত্রে এবং স্বীয়
অর্জনে, স্ব স্ব বিশেষত্বে এ তৃরিকাকে নানামাত্রিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ
নতুন অবয়ব দান করেন এবং একে কালোপযোগী দৃষ্টি
আকর্ষণীয়ভাবে নতুন মাত্রিকতায় ‘জাগ্রত’ করে তোলেন।

সুন্দর উনবিংশ থেকে একবিংশ শতাব্দীকে ধারণ করে থাকা মাইজভাণ্ডারের শতাধিক বছরের ইতিহাসে উর্দু, ফার্সি ও বাংলা ভাষায় বড় ছোট শতাধিক গ্রন্থ রচিত হলেও এক নজরে, চুম্বকসার বর্ণনার সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ মাইজভাণ্ডার বিষয়ে তথ্যনির্ভর বস্তুনিষ্ঠ ধারণা পাওয়ার মতো কোন এক প্রকাশনা না থাকার কারণে সাধারণ পাঠক মহল, বিশেষত অনুসন্ধিসুজন, বিদ্বৎ সমাজ, সর্বোপরি আগ্রাহী নতুন প্রজন্মের পাঠক সমাজ অনেকটা আশাহত, ক্ষেত্রবিশেষে বিভাস্তির চোরাগলি ও চোরাবালিতে পড়ে আশাভঙ্গের যাতনায় নিপত্তি হওয়ার আশংকাও থেকে যায় সততঃ। উল্লিখিত সামগ্রিক বিষয় বিবেচনায় রেখে মাইজভাণ্ডার বিষয়ক একটা চুম্বক সার বর্ণনা উপস্থাপনের পরিকল্পনা থেকে এ প্রবন্ধ রচিত।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কাল থেকে শুরু করে মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা তার ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণীয় বিশেষত্ব সমূহের কারণে দেশে এবং বহিঃবিশ্বে যেভাবে, যে মাত্রিকতায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং তাত্ত্বিক গবেষণার আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে এর মৌলিক বিশেষত্বগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নোক্ত ১৬টি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে-

- (১) ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক
- (২) দরবারকেন্দ্রিক আনুষ্ঠানিকতা
- (৩) সামাজিক বিশেষত্ব
- (৪) সাহিত্য ও প্রকাশনার বিশেষত্ব
- (৫) প্রবহমান ধারায় গান রচনা
- (৬) গানের বই ও ক্যাসেট প্রকাশ
- (৭) সমকালীন বিশিষ্ট মনীষীর লেখনীতে মাইজভাণ্ডার প্রসঙ্গ
- (৮) সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার বিশিষ্টজনদের অভিমত
- (৯) বাঙালির ঐতিহ্য ধারণ, লালন ও পৃষ্ঠপোষকতায় মাইজভাণ্ডার
- (১০) সমসাময়িক সমাজজীবনে প্রত্যক্ষ প্রভাব
- (১১) সমকালীন প্রচার মাধ্যমে
- (১২) চট্টগ্রামের সমাজজীবনে মাইজভাণ্ডার
- (১৩) দেশ-বিদেশের সংগ্রহশালায় মাইজভাণ্ডারী সাহিত্য
- (১৪) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার সিম্পোজিয়ামে মাইজভাণ্ডার
- (১৫) গবেষণার জগতে মাইজভাণ্ডার
- (১৬) গবেষণার ক্ষেত্রে প্রস্তুত এবং জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ক্ষেত্রে বিশেষত্ব।

এর মধ্যে জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো :

বাঙালির ঐতিহ্য ধারণ, লালন ও পৃষ্ঠপোষকতায় মাইজভাণ্ডার এবং চট্টগ্রামের সমাজজীবনে মাইজভাণ্ডার

বাঙালির ঐতিহ্য ধারণ, লালন ও পৃষ্ঠপোষকতায় একজন বাঙালি সুফিসাধক কর্তৃক বাঙালি জাতিকে একটি স্বতন্ত্র তুরিকা উপহার দেওয়া ঐতিহাসিকভাবেও একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এদিক থেকে বাঙালী জাতির সুমহান ঐতিহ্যে আর একটি সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে মাইজভাণ্ডার। শত বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত মাইজভাণ্ডারের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যে সমন্বয়ধর্মী-সংস্কৃতি তা হাজার বছরের বাঙালি ঐতিহ্য যোগ করেছে নতুন মাত্রিকতা।

বাঙালি জাতিসভার মর্মমূল থেকে উদ্ভূত বলে এই তুরিকার যাবতীয় কাজকর্ম বাংলা ভাষায়, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় সম্পাদিত হয়ে আসছে। বাংলা মাসের পঞ্জিকা হিসেবে মাইজভাণ্ডারের উরস্ ও খোশরোজ সমূহ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১০ই মাঘের উরস্ বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়া থেকেই (প্রথম উরস্ ১৯০৭) প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক বিষয় উল্লেখযোগ্য। বৃত্তিশ আমলে যখন রাষ্ট্রীয়ভাবে ইংরেজি সন্নের প্রচলন ছিল সর্বাধিক, আর ঐতিহ্যের সন্ধানের জটিলতা ও বিভাস্তির কারণে ঐ সময়ের বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ফার্সি ও উর্দু-প্রীতি ছিল তুঙ্গে, ঠিক ঐ সময় মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের যাবতীয় কাজ কর্মে বাংলা ভাষার সচেতন ও স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভাষা এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক ভাষায়ও অধিষ্ঠিত হয়েছে মর্যাদাপূর্ণভাবে। যা এই বাঙালি মহান আল্লাহর অলির গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এক কেরামত।

উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম ধর্মীয়, পরিমণ্ডলের প্রচলিত উর্দু-ফার্সির বলয় থেকে সচেতনভাবে বেরিয়ে এসে বাঙালির বাংলা ভাষার ব্যবহার, বাঙালির জাতিসভার বিকাশে মাইজভাণ্ডারের এক বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ অবদান। প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় অধিকাংশ মুসলিম ধর্মীয় প্লাটফরম যখন মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে অবলম্বন করেছিল, তখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মাইজভাণ্ডারের প্রকাশ্যে অবস্থান নেওয়া এবং প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ বাঙালি জাতিসভার সাথে মাইজভাণ্ডারের ঐতিহ্যগত সম্পর্কেরই বহিঃপ্রকাশ। বাঙালি জাতির ইতিহাসে স্মরণকালের শ্রেষ্ঠতম ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। এ মুক্তিযুদ্ধের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি এবং সমূহ-বিপদের কথা জেনেও প্রকাশ্যে এর পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফকে কালের পরীক্ষায় উন্নীত করে এর গণমুখী প্রগতিশীল ঐতিহ্যের সংযোজন করে এক ঐতিহাসিক দুর্লভ নতুন মাত্রিকতা।

বাঙালি জাতিসভার মননের জগতেও পরিলক্ষিত হয় মাইজভাণ্ডারী সংস্কৃতির অনুরণন। মননের জগতে বাঙালি জাতিসভার সাথে মিলে মিশে একাত্ম হয়ে আছে বলে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ

জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফের নির্মাণ-স্থাপত্যে
ব্যবহৃত হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা।
বলাবাহ্ল্য, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফেই সর্বপ্রথম নির্মাণ
স্থাপত্যে আমাদের জাতীয় ফুল শাপলার সার্থক ব্যবহার
পরিলক্ষিত হয়। ১৪

চট্টগ্রামের সমাজজীবনে মাইজভাণ্ডার
'প্রদীপের নীচে অঙ্ককার থাকে'
এ প্রচলিত প্রবাদ এর ব্যতিক্রম ইতিহাস-ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে
মাইজভাণ্ডার।

গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী তাঁর তৃরিকা প্রচারের প্রাথমিক
পর্যায়ে মূলত চট্টগ্রাম অঞ্চলেই এর কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল।
সমকালীন চট্টগ্রামের সমাজজীবনের নিজস্ব ক্ষেত্রে তাঁর
তৃরিকার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

চট্টগ্রামের অন্যান্য অলি-দরবেশ, খানকা, দরগাহ, মাজারের
সাথে মাইজভাণ্ডার দরবারের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। দরবারি
হিসেবে পারম্পরিক আসা ঘাওয়া, ধর্মীয় ও সামাজিক ভাব
বিনিময় সব মিলিয়ে একটা নতুন ভাব-পরিমণ্ডলের সৃষ্টি
হয়েছে।

সমসাময়িক বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, পণ্ডিত, স্বনামধন্য
ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অনেকে তাঁর দরবারে যেতেন, তাঁকে
আলাপ আলোচনা করতেন। এর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য
হলো-বাহারুল উলুম তথা 'জ্ঞানের সাগর' খ্যাত সমকালীন
স্বনামধন্য মুফতি মাওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদি,
সৈয়দ মাওলানা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরি। বলাবাহ্ল্য, তাঁর
মাইজভাণ্ডারের সুউচ্চ আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের বিবরণ দিয়ে
উল্লেখযোগ্যসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য-মাওলানা আমিনুল হক ফরহাদাবাদির
'আততাওজিয়াতুল বহিয়া' গ্রন্থটি পরবর্তীকালে মিসরের আল
আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল।

চট্টগ্রামের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে মাইজভাণ্ডারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা
করে গ্রন্থ রচনা এবং ওয়াজ মাহফিলের ব্যবস্থা করে মাওলানা
আজিজুল হক শেরে বাংলা আলকাদেরী মাইজভাণ্ডারীয়া
তৃরিকার প্রচার প্রসারে এক নতুন যুগের সূচনা করেন।
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের নেতা হিসেবে চট্টগ্রাম
অঞ্চলের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে তাঁর সম্মান প্রতিপত্তি আজও
কিংবদন্তির মতো উচ্চারিত। তিনি তাঁর 'দেওয়ানে আজিজ'
গ্রন্থে মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার এবং গাউসুল আয়ম
মাইজভাণ্ডারীর যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তা সত্যিই
প্রশংসনযোগ্য। এমনকি মাইজভাণ্ডার পরিমণ্ডলেও তাঁর
'দেওয়ানে আজিজ' গ্রন্থটি রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে আজও
নিঃসন্দিন্ধিত্বে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সমকালীন চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আলেম সম্প্রদায় কর্তৃক প্রশংসিত
এবং তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের মাইজভাণ্ডার বিষয়ে উচ্চ মার্গের

গ্রন্থ রচনার বিষয় স্থানীয়ভাবে চট্টগ্রামের ধর্মীয়-সমাজ জীবনে
স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করে।
প্রত্যক্ষভাবে ধর্মীয় পরিমণ্ডলের পাশাপাশি সমাজজীবনের
বিভিন্ন দিকে মাইজভাণ্ডারের সংশ্লিষ্টতা ও প্রভাব পরিলক্ষিত
হয় বিভিন্নভাবে, নানা মাত্রিকতায়। যেমন- (১)
সমাজজীবনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সংশ্লিষ্টতা, তাঁদের
সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন (২) বিশিষ্ট সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীর
লেখনীতে মাইজভাণ্ডার প্রসঙ্গ (৩) সমকালীন বিশিষ্ট
সাংস্কৃতিক ও সঙ্গীত ব্যক্তিত্বদের আকর্ষণ এবং তাঁদের
প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা (৪) চট্টগ্রামের প্রচার-মাধ্যমসমূহে বিশেষ
অবস্থান।

(১) স্বনামধন্য শিত্রাপতি চট্টগ্রামের এ কে খান পরিবার,
আবদুল বারী চৌধুরী পরিবার, মীর্জা আবু পরিবারসহ
চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিত্রাপতির প্রায় সিংহভাগই
পারিবারিকভাবে প্রায়- বংশানুক্রমে নিয়মিত দরবার শরিফে
আসা ঘাওয়া করেন। একই সাথে রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ
স্বনামধন্য চট্টগ্রামবাসীদের অনেকে ফয়েজ রহমত অর্জনের
জন্য দরবার শরিফে আসা ঘাওয়া করেন। এঁদের মধ্যে
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য পাকিস্তানের প্রাক্তন চিফ সেক্রেটারী
জনাব শফিউল আয়ম, সাবেক শ্রমমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান।
রাজনৈতিকভাবে দলমত নির্বিশেষে প্রায় সকলে দরবারের
প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। স্থানীয় ফটিকছড়ি এলাকা থেকে এ
পর্যন্ত নির্বাচিত সাংসদদের সকলে দল মতের উর্ধ্বে এই
দরবারের সাথে সংশ্লিষ্টতা বজায় রেখেছেন। চট্টগ্রামের
সাবেক মেয়র আলহাজ্ব এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সাবেক
মেয়র আলহাজ্ব মন্জুর আলম এবং সাবেক শ্রম ও কর্মসংস্থান
মন্ত্রী এম এ মান্নান প্রত্যক্ষভাবে এই দরবারের অনুসারী।

(২) চট্টগ্রামের বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী প্রায় সকলেই তাঁদের
লেখায় মাইজভাণ্ডারের বর্ণনা দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে
উল্লেখযোগ্য হলেন : অধ্যাপক আবুল ফজল, ডক্টর মুহম্মদ
এনামুল হক, আবদুল হক চৌধুরী, জাতীয় অধ্যাপক ডা.
নুরুল ইসলাম, প্রফেসর ইমিরেটাস ড. আবদুল করিম,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড.
ইফতেখার উদ্দীন চৌধুরী প্রমুখ।

অধ্যাপক আবুল ফজল ব্যক্তিগত জীবনে আচার ধর্মের প্রতি-
তুলনায় নৈতিক ধর্মকেই প্রাধান্য দেন বেশি। মাইজভাণ্ডারে এ
বিষয়টি লক্ষ্য করে, বিশেষত্ত্ব এর অসাম্প্রদায়িক গণচেতনার
বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি হ্যারত সৈয়দ গোলামুর
রহমান মাইজভাণ্ডারীর (বাবা ভাণ্ডারী) জীবনী গ্রন্থের দীর্ঘ
ভূমিকা লিখে দেন।

ডক্টর এনামুল হকের লেখনীতেই আমরা জানতে পারি যে,
তাঁর পিতা ছিলেন, মাইজভাণ্ডারীয়া তৃরিকার অনুসারী একজন
বিশিষ্ট ভক্ত। ড. এনামুল হক ১৯৪০ সালে তাঁর পিএইচডি
থিসিসে মাইজভাণ্ডার বিষয়ে গভীর বিশ্লেষণধর্মী লেখা
সংযোজন করেছেন। গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর ওফাত

শতবর্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর : শতবর্ষের আলোকে গ্রন্থের সুনীর্ঘ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন প্রফেসর ইমিরেটাস ড. আবদুল করিম। ড. ইফতেখার উদিন চৌধুরী মাইজভাণ্ডার বিষয়ক শুধু লেখালেখি নয়, সাংগঠনিকভাবে SZHM Trust এর মাইজভাণ্ডারী একাডেমির সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। (৩) চট্টগ্রামের সমকালীন স্বনামধন্য গীতিকার, সুরকার, শিশুদের প্রায় সকলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাইজভাণ্ডার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বিভিন্নভাবে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-কবিয়াল রমেশ শীল, মোহাম্মদ নাসির, আবু কাওয়াল, টুনু কাওয়াল, শেফালী ঘোষ, কল্যাণী ঘোষ প্রমুখ। কবিয়াল রমেশ শীলের মাইজভাণ্ডারী গানের সংখ্যা তিনি শতাধিক। কষ্টশিতী শেফালী ঘোষ মাইজভাণ্ডারের ভক্ত হিসেবে দেশে-বিদেশের যে কোনো অনুষ্ঠানে স্বতঃপ্রগোদিত হয়ে দু'একটি মাইজভাণ্ডারী গান অবশ্যই গেয়ে থাকেন।

(৪) চট্টগ্রামের প্রচার মাধ্যমগুলো তাদের যাত্রা-শুরুর কাল থেকেই মাইজভাণ্ডারকে শুরুত্বসহকারে উপস্থাপনার জন্য সদা সচেষ্ট। পত্র-পত্রিকাসমূহ সারা বছর মাইজভাণ্ডারের সংবাদ, প্রতিবেদন, বিশেষত উরস্স ও খোশরোজ শরিফসহ প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার খবর শুরুত্বসহকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করে থাকে। চট্টগ্রাম বেতার ও টেলিভিশন মাইজভাণ্ডারী গান এবং মাইজভাণ্ডার বিষয়ক সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি উরস্স ও খোশরোজ শরিফ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিভিন্নভাবে যাঁরা মাইজভাণ্ডারের সাথে সম্পর্কিত তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের জীবনে কোনো না কোন সময় কেরামতের ঘটনাও ঘটে থাকে।

চট্টগ্রামের সমাজজীবনে মাইজভাণ্ডারের সুদূরপ্রসারী প্রভাব এত বেশি মাত্রায় ক্রিয়াশীল যে, সমাজজীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রের সকল মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, মুখ্য বা গৌণভাবে, কোনো না কোনভাবে এই দরবারের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিদেশ গমন, চাকুরী, পদোন্নতি, রোগমুক্তি, সন্তান লাভ ইত্যাদি সমস্যার সমাধানের জন্যে হাজার হাজার লোক প্রতিদিন-প্রায় প্রতিনিয়ত মাইজভাণ্ডার গমনাগমন করেন। এর পাশাপাশি আর একটি বিষয় দেখার মতো, তা হলো, রাজনৈতিক ঘটনাবলীর পট পরিবর্তন কিংবা নির্বাচন ইত্যাদি ঘটনাবলীতে দলমত নির্বিশেষে সকলের গমনাগমন এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা। প্রাথমিক পর্যায়ে মাইজভাণ্ডারের সর্বজনবিদিত বিশেষত্ত্ব ছিল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের গমনাগমন এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা। এই পর্যায়ে সকলের অপূর্ব মিলনকেন্দ্র ছিল মাইজভাণ্ডার। বর্তমান সময়ে এসে এর সাথে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রিকতা। ধর্ম বর্ণের পাশাপাশি এখন যুক্ত হয়েছে দলমত নির্বিশেষে সকলের অপূর্ব মিলনকেন্দ্র; সর্বোপরি

সমকালীন সমাজজীবনের বিশিষ্ট জনদের সংশ্লিষ্টতা।

এককথায়, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের ঐতিহ্যমণ্ডিত আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের যে ব্যাপকতা ও গভীরতা তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চট্টগ্রামের সামগ্রিক সমাজ-সংস্কৃতিকে রীতিমতো বেষ্টন করে আছে।

এই তুরিকার প্রচার প্রসারের শুরু থেকেই গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর সোহৃদত্বাঙ্গ স্বনামধন্য খলিফাগণ বিভিন্নভাবে এ তুরিকার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে প্রচারের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বলাবাহ্ল্য, এর সিংহভাগই ছিল মুখে মুখে প্রচলিত ও প্রচারিত। লেখ্য রূপের তেমন কোন নির্দশন বড় বেশী পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ পর্যায়ে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কয়েকজন খলিফার বহুল আলোচিত কয়েকটি গ্রন্থের সঙ্গান মেলে। প্রকাশকালের দিক থেকে এগুলো সবই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। কালের ক্রমানুসারে এগুলো হলো আল্লামা আমিনুল হক ফরহাদাবাদীর তোহফাতুল আখইয়ার ও তওজিয়াতুল বহিয়া (১৯০৬), ফকির আমিনুল হক হারভাংগিরির ফকির উল্লাস (১৯০৭) ও ওফাতনামা (১৯০৮) এবং আবদুল গণি কাঞ্চনপুরীর আয়না-ই-বারী (১৯১০) কিন্তু এগুলোর মাধ্যমে মহাসমুদ্রকপী মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকাকে তাত্ত্বিক পর্যায়ে যথাযথভাবে বুঝা ও উপলব্ধি করা ছিল সত্যিই দুরুহ কাজ। ১৯৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি গবেষক ড. মুহম্মদ এনামুলহক তাঁর ফিসিসে এ তুরিকার দৃষ্টি আকর্ষণীয় বিশেষত্ত্ব বিশ্লেষণ করে একে ‘বঙ্গে ফকিরদের একমাত্র জগত আড়া কেন্দ্র’ ১৫ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত এর লিখিত তাত্ত্বিক ভিত্তি পরিপূর্ণভাবে গড়ে উঠেনি। ড. এনামুল হকের উচ্চতর প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার এহেন মন্তব্যের দীর্ঘ ২০ বছর পর ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার তাত্ত্বিক ভিত্তির প্রথম মাইলস্টোন ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ গ্রন্থ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৭৬-১৯৬০ প্রায় শতবর্ষের ব্যবধানে, আক্ষরিক অর্থে ৮৪ বছর পর প্রথম নির্মিত হয় সুনির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ভিত্তি। শত বছরের এ সুনীর্ঘ সময়কালে Oral Tradition এ চলে আসা “বঙ্গে ফকিরদের জগত আড়াকেন্দ্রে “তাত্ত্বিক দিগ দর্শন এর ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার কথা সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমিরেটাস ড. আবদুল করিম। তাঁর ভাষায়ঃ আমার বিবেচনায় তাঁর [সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর] রচিত বেলায়তে মোত্লাকাসহ ছোট বড় ডজন খানেক গ্রন্থ, অপ্রকাশিত লেখালেখি ও ব্যক্তিগত ডায়েরী মাইজভাণ্ডারী দর্শনের এক মহামূল্যবান সম্পদ। বিভ্রান্তিকর নানা ডামাড়োলের মধ্যেও প্রকৃত মাইজভাণ্ডারকে জানা ও বুঝার ক্ষেত্রে এগুলো দিগদর্শন ও ধ্রুবতারা স্বরূপ ১৬ এ প্রসঙ্গে পীরে তুরিকত ও ইমামে আহলে সুন্নাহ আল্লামা

কাজী নূরুল ইসলাম হাশেমীর মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্যঃ “নিঃসন্দেহে তিনি উচ্চ মার্গের অলি-আল্লাহ ছিলেন। তাঁর মধ্যে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কুরআন-হাদিস-ফিকাহ্র উপর যে পাণ্ডিত্য ছিল তা নিঃসন্দেহে ইলমে লুদুনী। হ্যরত কেবলা [ত্বরিকার প্রবর্তক ও তদীয় দাদা শাহ আহমদ উল্লাহ মাইজভাঙ্গারী] তাঁকে যথার্থই ‘অছি’ (VICEGERENT) হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। হ্যরত কেবলার ওফাতের পর ‘মাইজভাঙ্গার’ নাম দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যখন স্বার্থান্বেষী মহল ভগ্নামি ও কপটতার আশ্রয় নিতে শুরু করল, তখন অছিলে গাউসুল আয়ম তা কঠোর হস্তে দমন করার সংগ্রাম শুরু করলেন। তাঁর কারণে পবিত্র মাইজভাঙ্গার শরিফ ভগ্নামির আশ্রয়স্থল হয়নি।”^{১৭}

অছি-এ-গাউসুল আয়ম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাঙ্গারী (কঃ) যে তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে কর্ম উদ্দেয়োগ? তা মাইজভাঙ্গারীয়া ত্বরিকার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জল স্বর্গযুগ। মাইজভাঙ্গারের শত বছরের ইতিহাসেরও তৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক। অছি-এ-গাউসুল আয়ম তদীয় দাদার রক্ত ও বেলায়তের মনোনিত যোগ্যতম উত্তরাধিকারী হিসেবে মাইজভাঙ্গারীয়া ত্বরিকার তাত্ত্বিক ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে ছোট বড় ১২টি গ্রন্থ১৮ রচনা ও প্রকাশ করেন। একইসাথে তাত্ত্বিক ভিত্তিকে বাস্তব ক্ষেত্রে ঝুপায়নের প্রয়োজনে গড়ে তোলেন এক অনন্য সংগঠন ‘আঙ্গুমানে মোতাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাঙ্গারী’।^{১৯} হ্যরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাঙ্গারীর ঐতিহাসিক বড় বিশেষত্ব ছিল, তিনি তাত্ত্বিক আলোচনা এবং সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের একটা যোগসূত্র রচনা করে এ দুই ধারাকে প্রায় সমান্তরাল গতিতে প্রবহমান রেখেছিলেন। বলাবাহ্ল্য, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তিনি রীতিমতো একটা আদর্শ স্থাপন করে যান তত্ত্ব ও বাস্তবতার সু সমন্বয়ে। তাঁর এই ধারায় এক বিংশ শতাব্দীর প্রথমে নতুন ধারায়, নতুন মাত্রিকতায় সংযোগ ঘটে এক বহুল আলোচিত সংগঠন SZHM Trust. তদীয় প্রথম পুত্র শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাঙ্গারী ছিলেন জীবিত কিংবদন্তি। তাঁর ওফাতের পর তদীয় একমাত্র উত্তরাধিকারী পুত্র গাউসিয়া হক মন্জিলের মনোনিত সাজাদানশীল আলহাজ্জ সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাঙ্গারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে এই অনন্য সংগঠন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিম এবং পীরে কামেল নূরুল ইসলাম হাশেমীর যে সুগভীর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, সমকালের সার্বিক বিশ্ব প্রেক্ষাপটে চরম বিচ্যুতি, বিভাট আর বিভাতির ঘূর্ণাবর্তে স্থান কাল পাত্র ভেদে মাইজভাঙ্গার দরবার শরিফের শুন্দতা রক্ষার ঐতিহাসিক এ যুগ সন্ধিক্ষণে যুগপৎ তাত্ত্বিক আলোচনা-পর্যালোচনা এবং বাস্তব ক্ষেত্রে জীবনঘনিষ্ঠ দিগনির্দেশনামূলক দায়িত্বশীল সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এহেন প্রেক্ষাপটে

SZHM Trust এর সুপরিকল্পিত ও সুচিত্তিত সামগ্রিক দিগনির্দেশনামূলক বক্তব্য ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড লাখে মাইজভাঙ্গারী আশেক ভক্ত, সিরাতুল মুস্তাকীম অনুসন্ধানী বৃহত্তর মুসলিম সমাজসহ সামগ্রিকভাবে মানবতার জন্য এক দৃষ্টি আকর্ষণীয় দিগন্দর্শন হিসেবে আবির্ভূত; যা অছিয়ে গাউসুল আয়ম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাঙ্গারীর কর্ম ও মর্মের কালোপযোগী সম্প্রসারিত রূপ হিসেবেই বিবেচ্য।

এক নজরে শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাঙ্গারী (কঃ) ট্রাস্ট SZHM Trust

পবিত্র কুরআন-হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা ধারণ, প্রচার ও প্রসারের মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাইজভাঙ্গারী ত্বরিকার ধ্রুব নক্ষত্র শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাঙ্গারী (১৯২৮-১৯৮৮) -এর সম্মানিত উত্তরাধিকারী, অনুসারী ও ভক্তবৃন্দ কর্তৃক ২০১১ সালে শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাঙ্গারী (কঃ) ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। যদিও এর কার্যক্রম ১৯৯৫ সাল থেকে চালু ছিল। এই ট্রাস্ট কুরআন ও সুন্নাহৰ আদর্শ ত্বরিকার বুজুর্গগণ তাঁদের জীবনে যেভাবে বাস্তবায়িত করেছেন তারই আলোকে সমাজ জীবন থেকে দুর্নীতি, শোষণ, বংশনা ও সংঘাত নির্মূল করে সমাজে সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই ট্রাস্ট মাইজভাঙ্গারী দর্শনের মূল শিক্ষা-বিশ্বব্রাত্ত ও সর্বজীবের প্রতি অক্ষিম ভালোবাসা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজের দরিদ্র, সুবিধাবণ্ডিত ও নিঃস্বদের সাহায্য এবং সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক কাজ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত। সামাজিক ন্যায়বিচার ও একতা প্রতিষ্ঠা, মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়নের মাধ্যমে ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে এই ট্রাস্ট নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা ও সেবা প্রদান করে আসছে।

(ক) শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তটি এতিমখানা ১টি চট্টগ্রামে, ১টি কুমিল্লায় এবং ১টি নরসিংহদীতে : ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষা প্রদান: দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন ২৩টি স্কুল ও মাদ্রাসায় ২৯৪২জন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা প্রদান করা হয়।

মানবীয় সেবা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান: ১৭০ জন এতিমকে পুনর্বাসন করা হয়েছে

(খ) বৃত্তি তহবিল: শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে এ পর্যন্ত ৭৩৫ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে ২১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫ সাল হতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালনাধীন উচ্চ বিদ্যালয়সমূহে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। তাছাড়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রিত ৭ ও ৮নং ওয়ার্ড এর প্রান্তিক এলাকা থেকে দরিদ্র মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে ৫০টি বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০১৮ সালে মোট ১৫০জনকে বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্য মাত্রা

নির্ধারণ করা হয়েছে।

(গ) কারিগরি শিক্ষা: সামাজিক উন্নয়নে কারিগরি জ্ঞানসমৃদ্ধ দক্ষ জনশক্তির বিকাশ নাই। বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে এই ট্রাস্ট দরিদ্র, মেধাবী শিক্ষার্থীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য বৃত্তি প্রদান করে থাকে। ২০১৫ সাল থেকে এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ২০১৭ সালে ৪০ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০১৮ সালে মোট ৫০জনকে বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হিসেবে ড্রাইভিং কোর্সও চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত দুই ব্যাচে মোট ২৫জন বেকার যুবককে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) ধর্মীয় শিক্ষা: রাসূল (দঃ) বলেছেন: জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয। এই ধারাবাহিকতায় অত্র ট্রাস্ট মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশের শাখা কমিটি সমূহের সদস্যদের জন্য মাস্যালা-মাসায়িল প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করেছে। এ পর্যন্ত ১৫০ জন সদস্যকে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এটা একটি চলমান প্রক্রিয়া। একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী সমাজ বিনির্মাণে মহিলাদের অবদান অন্তর্বিকার্য। তাই অত্র ট্রাস্ট মহিলাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করে নিয়মিতভাবে মহিলাদের জন্য সমাবেশ এবং আলোচনা সভা ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে মাস্যালা-মাসায়িল এবং উপস্থাপনা কৌশল প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। এ পর্যন্ত ২০০জন সদস্যকে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এটাও একটি চলমান প্রক্রিয়া।

(ঙ) শিক্ষক প্রশিক্ষণ: অত্র ট্রাস্টের নিয়ন্ত্রণাধীন ২৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জ্ঞান ও শিক্ষা দানের আধুনিক কলা-কৌশল শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে থাকে। ২০১৭ সাল পর্যন্ত ২৫০ জন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এটিও একটি চলমান প্রক্রিয়া।

(চ) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা: ইসলামের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য বিষয়ে অত্র ট্রাস্ট নিয়মিতভাবে চিত্র ও ভিডিও প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে। এর মাধ্যমে দর্শনার্থীগণ ধর্মের সঠিক চিন্তা চেতনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন। ফলে তারা সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বিভাগিকর তথ্য এবং তত্ত্ব থেকে সত্য আলাদা করে নিজস্ব সঠিক মতামত গ্রহণ করতে পারেন।

(ছ) সংলাপ: আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান এই নীতিতে অটল বিশ্বাসকে ভিত্তি করে বিভিন্ন ধর্মীয় মত-বিরোধ নিরসন করে এই ট্রাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও দেশবরেণ্য আলেমদের সমন্বয়ে সংলাপের আয়োজন করে থাকে। সংলাপে জ্ঞানগত প্রশ্নাত্তরের মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতা অনেক অজানা তথ্য জানতে পারেন এবং বিভিন্ন বিভাগিকর তথ্য বর্জন করে জীবনের নতুন দিগন্তে প্রবেশ করতে সক্ষম হন।

(জ) মাইজভাণ্ডার শরিফ গণ্ঠাগার: ধর্মীয় ও দার্শনিক শিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ।

দরিদ্র বিমোচন

(ক) যাকাত তহবিল: ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে সহায়তা ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের মানবিক সাহায্য হিসেবে এ পর্যন্ত ১৫৫৩ জনকে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ ৯ হাজার ৯শত ৩০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সাধারণভাবে যাকাতের অর্থ হতে গৃহ নির্মাণ, মেয়ের বিয়ে, দূরারোগ্য রোগের চিকিৎসা, বিদেশে চাকুরীতে যোগদানের জন্য বিমান ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তাছাড়া যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তিকে যাকাত প্রদানকারী হিসাবে উন্নীত করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র নিয়োগকারীকে প্রকাত সহায়তা প্রদান করা হয়।

(খ) অমুসলিম দুঃস্থ সহায়তা তহবিল: অমুসলিম দুঃস্থ তহবিল থেকে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে

(গ) সাধারণ দুঃস্থ সহায়তা তহবিল: সাধারণ দুঃস্থ তহবিল থেকে আশেক-ভক্তদের সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে স্বাস্থ্যসেবা: মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ হোসাইনী দাতব্য চিকিৎসালয়-এ অসহায় ও দুঃস্থ ব্যক্তিবর্গের বহিংবিভাগীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান। ২০১৫ সালে দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশন এবং ২০১৬ সাল হতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা কর্মসূচি নিয়মিতভাবে চালু রয়েছে। ২০১৭ সালে দুই হাজার রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণা ও প্রকাশনা: বাংলায় প্রকাশিত তাসাওউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল ‘মাসিক আলোকধারা’ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ইসলাম ধর্মীয় সঠিক আক্রিদা প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে অত্র ট্রাস্টের পরিচালনায় গবেষণা ও প্রকাশনা শাখা গঠন করা হয়েছে। গবেষণার বিষয় বস্তু কুরআন, সিহাহ সিন্তাহ হাদিস, মাইজভাণ্ডারী দর্শন ও চেতনার সাথে সংগতিপূর্ণ মহৎ, মানবতাবাদী চিন্তা, ইসলামের ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজ ভাবনার তথ্য ও উপাত্ত। এ পর্যন্ত অত্র ট্রাস্ট প্রকাশন ‘আলোকধারা বুকস’ কর্তৃক ২০টি বই প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৮ সালে ৩০টি বই প্রকাশের জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

মাইজভাণ্ডারী একাডেমি: মাইজভাণ্ডারী দর্শন এবং সুফি মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ২০০২ সালে এই একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই একাডেমি ধর্মীয় দর্শন বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন করে আসছে। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ২০১০ সাল থেকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলনের আয়োজন করছে। এই আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলনে দেশ-বিদেশের অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, সুদান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া ও ভারতের সুফি গবেষক এবং ইসলামী চিন্তাবিদগণ অংশগ্রহণ করেন। ফেব্রুয়ারি ২০১২ সালে ভারতের গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলনে একাডেমির

প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হয়ে ‘মাইজভাণ্ডারী দর্শন ও বিশ্বশান্তি’ শীর্ষক মূলপ্রবন্ধ সমূহের একটি উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য, মাইজভাণ্ডারী একাডেমি এ পর্যন্ত খুটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলন আয়োজনের গৌরব অর্জন করেছে।

সাংস্কৃতিক: অত্র ট্রাস্টের আওতাধীন ‘মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী’ আধ্যাত্মিক সংগীত বিশেষ করে মাইজভাণ্ডারী সংগীতের চর্চা ও গবেষণার জন্য একটি নিবেদিত প্রতিষ্ঠান। এ গোষ্ঠী দেশ-বিদেশে সরকারি ও বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বহু অনুষ্ঠানে মাইজভাণ্ডারী সংগীত পরিবেশন করে আসছে। বর্তমানে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ গাউসিয়া হক মন্জিল ও নগরীর বিবিরহাটস্থ গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ শরিফে মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী একটি সংগীত বিদ্যালয় পরিচালনা করে থাকে।

বিশেষ সেবা: জনগণের নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসির) সহায়তায় চট্টগ্রাম শহর থেকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে যাতায়াতের সুবিধার্থে বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় নগরীর মুরাদপুর, নাজিরহাট ও মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে দৃষ্টিনন্দন যাত্রী ছাউনী নির্মাণ করা হয়েছে। নগরীর এ.কে খান মোড়, দামপাড়া, বহুদারহাট ও নাজিরহাট ঝংকার মোড়ে যাত্রী ছাউনী নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া দরবার শরিফের বিশিষ্ট দিবসসমূহের জন্যে বিশেষ বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহে আগত মেহমানদের জন্যে সুবিধাসমূহ: ন্যায্যমূল্যে, খাবারের দোকান, সুপেয় পানীয় জল, ওয়ু, অস্থায়ী ট্যালেট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি।

visit our website: www.sufimaizbhandari.org.bd

আলোকধারা বুক্স এর প্রকাশনা-তালিকা

- ০১। শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) -জামাল আহমদ সিকদার (১৯৮২, ১৩স. ২০১৭)
- ০২। Shahanshah Ziaul Huq Maizbhandari Syed Amirul Islam ১৯৯২-২০১৮
- ০৩। The Divine Spark -Ghulam Rasul (১৯৯৪-২০১৮)
- ০৪। শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব -মোঃ মাহবুব উল আলম (১৯৯৫, ২০১৮)
- ০৪। হ্যরত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) ওফাত শতবার্ষিকী বিশেষ প্রকাশনা -মোঃ মাহবুব উল আলম (১৯৯৫)
- ০৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের ভূমিকা -মোঃ মাহবুব উল আলম (২০০৯)
- ০৬। মাইজভাণ্ডার শরিফ পরিচিতি -ড. সেলিম জাহাঙ্গীর

(২০১৪, ২০১৭)

- ০৭। মাইজভাণ্ডারী জীবনবোধ ও কর্মবাদ -মোঃ মাহবুব উল আলম
- ০৮। হ্যরত শেখ নিজাম উদ্দিন আওলিয়া (রহঃ) : জীবন ও কর্ম -প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মাল্লান চৌধুরী (২০১৫)
- ০৯। ছহীহ নূরানী অজিফা
- ১০। উরস হাদীয়ার তরতীব
- ১১। ইসলামের দৃষ্টিতে তাক্লিদ ও মাযহাব -মাওলানা শায়েস্তা খান ও মাওলানা হাবিবুল হোসাইন
- ১২। বিশ রাকাত তারাভীহ নামায -ড. মাওলানা মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ
- ১৩। রমেশ শীল: মাইজভাণ্ডারী গান সমগ্র -ড. সেলিম জাহাঙ্গীর ২০১৫, ২০১৭
- ১৪। ছোটদের মাইজভাণ্ডার শরিফ -মোঃ ওহীদুল আলম (২০১৫)
- ১৫। মাওলানা হাদী: মাইজভাণ্ডারী গান সমগ্র -ড. সেলিম জাহাঙ্গীর ২০১৮
- ১৬। গল্লের বাতায়ন -মোঃ ওহীদুল আলম (২০১৮)

তথ্য নির্দেশিকা

০১. AIN-1- AKBARI. JARRET. VOL III. চ. ৩৫৪-৩৫৫
০২. মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, প্রথমখণ্ড, মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৯, পৃ. ১৩৮. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত মেধাবি ছাত্র এনামুল হক একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর পিএইচডি থিসিস SUFIISM IN BENGAL এ মাইজভাণ্ডারের আধ্যাত্মিক মহাত্ম্য নিয়ে তৎপর্যপূর্ণ অনেক আলোচনা করেছেন। ১৯৪০ সালের এ থিসিস পরবর্তীকালে তাঁর রচনাবলীতে সন্নিবেশিত হয়।
০৩. গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী ও তাঁর প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকাকে বস্ত্রনিষ্ঠিভাবে জানার জন্য তাত্ত্বিক আকর গ্রহ হল ‘বেলায়তে মোত্লাকা’। এটি গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে নিঃসন্দিক্ষিতভাবে। রয়েল সাইজের ১৪৫ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে ২৯টি আরবি ও ফার্সি কিতাব এবং তিনি বাংলায় রচিত গ্রন্থ থেকে দলিল প্রমাণাদি; তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে তিনি তাঁর নিজস্ব বক্তব্য বিষয়কে সুন্দর ও যুক্তিগ্রাহ্যভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠক সমীপে উপস্থাপন করেছেন। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত এ গ্রন্থটির বর্তমানে ১৪তম সংস্করণ প্রবহমান। ১৫টি পরিচ্ছেদে ৬৩টি বিষয় নিয়ে গভীর তাত্ত্বিক আলোচনার এ গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে নবুঘৃত, বেলায়ত, গাউসিয়ত, কুতুবিয়ত ইত্যাদির আলোচনা এবং এরই প্রেক্ষাপটে বেলায়তে মোত্লাকার যুগ, গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর আবির্ভাব, তাঁর বর্ণনা, তদীয় মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

০৪. মাইজভাণ্ডারীয়া তৃতীকা সমস্ত তৃতীকার সমাবেশ ও সর্ব বেষ্টনকারী। কাদেরীয়া, চিশ্তিয়া, নক্বন্দিয়া, মোজাদ্দেদিয়া, কলন্দরিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, তৈপুরীয়া, জোনায়দীয়া ইত্যাদি তৃতীকা এর অন্তর্ভুক্ত। সূত্র : মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া, সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, ভাণ্ডার শরিফ, পৃ. ১৩২।

০৫. বেলায়তে মোত্লাকা, সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, ভাণ্ডার শরিফ, পৃ. ১৩২।

০৬. বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থের আলোকে মাইজভাণ্ডারীয়া তৃতীকার বৈশিষ্ট্য।

০৭. আজ থেকে ১৪২ বছর পূর্বের এটিই এ পর্যন্ত প্রাপ্ত মাইজভাণ্ডার বিষয়ে প্রাচীনতম তথ্য। সূত্র: ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

০৮. গাউসুলায়ম মাইজভাণ্ডারীঃ শতবর্ষের আলোকে, ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, গাউসিয়া আহমদিয়া মন্জিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম, দ্বি-প্র, ২০১২, পৃ. ১২

০৯. মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, বাংলা একাডেমি-ঢাকা, ১৯৯৯ পৃ. ৩৫০

১০. বিজ্ঞাপনের বর্ণনা ও আলোকচিত্র, মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পূর্বোক্ত পৃ. ১৬৮-১৬৯, ৪০৭

১১. সংগ্রাহক ছিলেন চট্টগ্রামের আওতাতে চৌধুরী। উদ্ভৃত, মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ. ৩

১২. গীতিকার ও শিত্তানী ছিলেন চট্টগ্রামের মো: নাসির। উদ্ভৃত, মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, পৃ. ১২

১৩. এনামুল হক রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদনা, মনসুর মুসা, বাংলা একাডেমি-ঢাকা, ১৯৯১ পৃ-১৩৮

১৪. শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর রওজা শরিফের মূল স্থপতি আলমগীর কবিরের একান্ত স্মৃতিচারণ। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য: শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, মো: মাহবুব উল আলম সম্পাদিত, আলোকধারা বুক্স, মাইজভাণ্ডার শরিফ, পৃ: ১১৬।

১৫. এনামুল হক রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮.

১৬. ড. আবদুল করিমের ভূমিকাংশ। গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী : শত বর্ষের আলোকে, ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, গাউসিয়া আহমদিয়া মন্জিল, ভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম দ্বি-স ২০১২, পৃ. ৩.

১৭. মাসিক জীবন বাতি, ডিসেম্বর ২০০৬- ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৬.

১৮. কালের ক্রমানুসারে এগুলো হলো : (১) বেলায়তে মোত্লাকা (১৯৬০), (২) গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী : জীবনী ও কেরামত (১৯৬৭), (৩) মুসলিম আচার ধর্ম

(১৯৬৭), (৪) মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া (১৯৬৭), (৫ ও ৬) মূল তত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাসার (১ম ও ২য় খণ্ড-১৯৬৯), (৭) প্রতিবাদলিপি (১৯৭৩) (৮) বিশ্বমানবতায় বেলায়তের স্মরণ (১৯৭৪), (৯) এলাকার রেনেসাঁ যুগে একটি দিক (১৯৭৪), (১১) মানব সভ্যতা, ১৯৭৫)

১৯. সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর সর্বপ্রথম গ্রন্থ ‘বেলায়তে মোত্লাকা’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। এরও প্রায় এক যুগ আগে তিনি গড়ে তোলেন এক অনন্য সংগঠন- ‘আঙ্গুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী’। আনুষ্ঠানিকভাবে মাইজভাণ্ডারের তত্ত্বগত বিষয়াদি আলোচনা পর্যালোচনার ১১ বছর পূর্বে মাইজভাণ্ডারের ব্যবহারিক কার্যক্রমে সাংগঠনিক রূপরেখার অপরিহার্যতার কথা আমাদের বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয় ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘আঙ্গুমানে মোস্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী’র প্রতিষ্ঠা ও সাংগঠনিক কার্যক্রম। বলাবাহ্ল্য, তাত্ত্বিক ভিত্তিতে স্থান-কাল-পাত্রের বিবেচনায় একান্ত জীবন ঘনিষ্ঠতায় বাস্তব ক্ষেত্রে লাগসই বাস্তব রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সুচিত্তি ও সুপরিকল্পিত সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতার বিষয়টি আজও অনুভূত হয় প্রায় প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত।

ড. সেলিম জাহাঙ্গীর। মাইজভাণ্ডার বিষয়ক সাবেক সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বাংলা একাডেমি-ঢাকা। সুফিতত্ত্ব বিষয়ে রিসার্চ ফেলো, ফিনিস একাডেমী, হেলসিংকী-ফিনল্যান্ড। গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী ওফাত শতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির মহাসচিব। মাইজভাণ্ডার বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: মাইজভাণ্ডার সন্দর্শন, বা. এ. ঢাকা ১৯৯৯, মাইজভাণ্ডারী তৃতীকার তাত্ত্বিক বিশ্লেষক: সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (২০০০, ২০০৫), গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী শত বর্ষের আলোকে (২০০৭, ২০১২)। আহমদিয়া মন্জিল, ভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম। মাইজভাণ্ডার শরিফ পরিচিত (২০১৪, ২০১৬, ২০১৭), রমেশ শীল: মাইজভাণ্ডারী গান সমগ্র (২০১৫, ২০১৭), মাওলানা হাদী: মাইজভাণ্ডারী গান সমগ্র (২০১৭), আলোকধারা বুক্স ভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।

[SZHM Trust এর উদ্যোগে ১০ মাঘ উপলক্ষ্মে ১০দিনব্যাপি কর্মসূচীর প্রথম দিনে ১৩ জানুয়ারি শনিবার ২০১৮ চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিয়নায়তনে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত]

(ক) বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব

• ড. হাফেজ আল্লামা মুহাম্মদ মহিউল হক •

০১. আলোচনার শুভ সূচনায় শাহানশাহু সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র একটি অমীর বাণী স্বীকৃতজ্ঞ-বিন্দু চিঠে স্মরণ করছি, “জ্ঞানের যে সাধনা মনে উদারতা ও চরিত্রে দৃঢ়তা আনে সেটাই সঠিক জ্ঞান”। জাতি গঠনে শিক্ষার চেয়ে গুরুত্ববহু উপাদান আর কিছুই নেই। পদ্ধতিগতভাবে জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়াকে শিক্ষা বলে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা তাত্ত্বিক জ্ঞানকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকি। তাত্ত্বিক জ্ঞান যতটা গুরুত্ববহু, তেমনি ব্যবহারিক জ্ঞান থাকাও জরুরী। তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হলে ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

ব্যবহারিক শিক্ষা - জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই সত্যিকার অর্থে এর বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান-শক্তি অর্জন করা যায়। এ ধারাবাহিকতায় প্রথ্যাত দার্শনিক বেকন বলেন ‘জ্ঞানই শক্তি’ মহান রাবুল আলামীন শক্তি অর্জনে উৎসাহিত করে। পবিত্র কালামে পাকের ১০ পারার ০৩ পৃষ্ঠায় বলেন ‘তোমরা তোমাদের সাধ্যমতো শক্তি অর্জন করো’ (সূরা আনফাল : ৬০)।

০২. বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহারিক শিক্ষার অন্যতম বাহক বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ হারাচ্ছে। ‘বাংলাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা’ নামক গবেষণামূলক একটি বইয়ে উল্লেখিত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত আট বছরে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী কমার হার ৩১.৩৩ শতাংশ। শতকরা ৬৫ জন মনে করে বিজ্ঞানে বিষয়ভিত্তি প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই, ৬৯ জন মনে করে বিজ্ঞানে পড়লে প্রাইভেট পড়তে হয় এবং ৫৭ জন প্রাইভেট পড়ে। ৬৫ জন মনে করে বিজ্ঞানের জন্য আলাদা গবেষণাগার নেই, ৫৮ জন মনে করে ব্যবহারিক ক্লাসে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই, ৯৪ জন বলেছে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান মেলা হয় না।

০৩. বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষা দ্বীনি এবং দুনিয়াবী শিক্ষার অপরিহার্য একটি ব্যবস্থা হলেও এ শিক্ষায় রয়েছে বহুমুখী সীমাবদ্ধতা। শিক্ষক থাকলে ক্লাস নাই, ক্লাস আছে তো ছাত্র নাই, ছাত্র থাকলে ব্যবহারিক শিক্ষার ল্যাব নাই। ল্যাব থাকলেও দক্ষ শিক্ষক এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নাই। দক্ষ শিক্ষক থাকলেও বেতন নাই। এমন বহুবিধি সমস্যার আবর্তে এগিয়ে চলছে মাদ্রাসা শিক্ষা। তবে বাংলাদেশ সরকারের বহুমুখী পদক্ষেপ এর ফলে বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষায় সত্যিকারের আলোমে দ্বীন হওয়ার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষায় দক্ষ কর্মী-মেধাবী সুনাগরিক হয়ে উঠতে অনেক ভূমিকা রাখছে।

০৪. বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাদেশে সবচেয়ে ধীর গতিতে আছে কারিগরি শিক্ষা। এ শিক্ষায় শিক্ষিতের হার কাঞ্চিত মাত্রায় পৌছানোর চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে মাত্র। অথচ উন্নত দেশগুলোতে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিতের হার ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ। দেশের কারিগরি শিক্ষা খুবই নাজুক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বিষয়ভিত্তিক হাতে কলমে শিক্ষা দেয়ার সামগ্রী এবং দক্ষ শিক্ষক অপ্রতুল। ফলে উৎপাদনমুখী ও স্বনির্ভর অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো দৃশ্যমান হয়ে উঠেনি। তবে বর্তমান সরকার এর বহুমুখী পদক্ষেপ ব্যবহারিক শিক্ষায় সকলকে আশা আলো দেখায়। বিজ্ঞান শিক্ষার সমান্তরালভাবে কারিগরি শিক্ষার বিস্তার ছাড়া আধুনিক বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় বর্তমান সময়ের ছাত্র/ছাত্রীরা টিকে থাকতে পারবে না। মেধাবীদের আকস্ত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নেতৃত্বাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানোও অপরিহার্য।

ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব

০১. পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে: ‘তিনি যাকে ইচ্ছা হিক্মত (জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৌশল) প্রদান করেন এবং যাকে হিক্মত প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়; এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে’ (সূরা বাকারা : ২৬৯)। এই আয়াতে কারীমার মাধ্যমে মহান রাবুল আলামীন হিক্মত তথা বাস্তব কৌশল এবং ব্যবহার ভিত্তিক জ্ঞান এর বিষয়টি মানব জাতিকে স্মরণ করে দিয়েছেন। এই আয়াতে কারীমা দ্বারা বিশ্বব্যাপী ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব উন্মোচিত হয়। কেননা যে জ্ঞান বা শিক্ষার মধ্যে ব্যবহারিক শিক্ষা নেই সেটাতে কাঞ্চিত ফল লাভ করা সম্ভব নয়। বর্তমান সময়ের বাস্তবতাও কিন্তু তাই বলে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- বর্তমান বিভিন্ন কোম্পানীতে বিশেষ করে মোবাইল কোম্পানীগুলোতে ব্যবহারিক শিক্ষা জ্ঞান সমৃদ্ধ একজন ডিপ্লোমা পাশ (এইচএসসি সমমান) বেতন পেয়ে থাকেন ৪৫০০০-৫০,০০০ হাজার টাকা সেখানে একজন সাধারণ শিক্ষায় এম.এ পাশ কর্মকর্তা বেতন পান ১০,০০০-১২,০০০ হাজার টাকা। উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহর ভাষায় “বিপুল কল্যাণ ও সমৃদ্ধি” বাস্তবের বেতন ভাতায় এই বিশাল ব্যবধানই ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলছে।

০২. দেশে এবং বিদেশে ব্যবহারিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ একজন ব্যক্তি বেতন-ভাতা পান সাধারণ শিক্ষার ব্যক্তির চেয়ে অনেক

গুণ বেশি। ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকায় কাজ জানলেও কর্মীরা অনেক সময় উপযুক্ত বেতন ভাতা পাইনা, বিশ্বব্যাপী এটাই বাস্তবতা। বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে জনবিস্ফোরণ হিসেবে ভাবা হলেও শুধুমাত্র ব্যবহারিক শিক্ষাটা শিশুকাল থেকে বাধ্যতামূলক থাকার কারণে চীন বিশ্বব্যাপী তাদের বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিনত করে বিশ্বব্যাপী উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

০৩. বাংলাদেশে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতি বেশী জোর দেয়া হলেও বিভিন্ন বিষয়ে সীমাবদ্ধতায় সরকারের জনগুরুত্বপূর্ণ এ পদক্ষেপ বাস্তবায়নে ধীর গতি লক্ষ্যনীয়। সরকার বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার আইসিটি ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, বিজ্ঞান ল্যাব স্থাপন করে দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে অনেক প্রতিষ্ঠান এ সব ক্ষেত্রে ব্যবহারিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। ব্যবহারিক শিক্ষাকে বেশিরভাগ সময়ই অবহেলা করে শুধু তাত্ত্বিক শিক্ষাকেই গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক জ্ঞান বেশি দিচ্ছে, যার ফলে শিক্ষার্থীরা তার ব্যবহারিক জীবনে শিক্ষার যথাযথ প্রয়োগ করতে কিংবা যথাযথ জ্ঞান অর্জনে পুরোপুরি ব্যর্থ হচ্ছে।

০৪. বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় চতুর্থ বিষয় অর্থাৎ ব্যবহারিক শিক্ষায় কোনো গুরুত্ব না দিয়ে অন্য বিষয়গুলোয় গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চতুর্থ বিষয়ে সম্ভাবনা দুই দিনের বেশি পাঠদান করা হয় না। আর পাঠদান হলেও ব্যবহারিক কোনো শিক্ষা না দিয়ে শুধু তাত্ত্বিক শিক্ষা দেয়া হয়। ব্যবহারিক শিক্ষার অংশ হিসেবে ছবি আঁকা, বা বিভিন্ন ধরণের গবেষণা করা, আইসিটি, সফটওয়্যার ডেভেলপার তৈরী করা, বিশ্বব্যাপী নিজেকে উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করার মতো ব্যবহারিক জ্ঞান এর কথা থাকলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে সেগুলোর বাস্তবসম্মত কোন প্রয়োগ নেই। পরীক্ষায় জমা দেয়া ব্যবহারিক খাতাগুলোয় ছবি আঁকার যে তারিখ দেয়া হয়, শিক্ষার্থীরা সেই তারিখে ছবিগুলো সাধারণত আঁকেন। পরীক্ষার কয়েক দিন আগে সেগুলো বড় কাউকে দিয়ে আঁকিয়ে নেয়। ব্যবহারিক খাতার প্রতিটি পরীক্ষণে শিক্ষার্থী নিজের নাম লিখলেও ওই ছবিগুলো সে অঙ্কন করেন। বর্তমানে বিভিন্ন দোকানে ব্যবহারিক খাতা পাওয়া যায়, একশ্রেণীর লোক টাকার বিনিময়ে ব্যবহারিক খাতার ছবিগুলো এঁকে দেয়। আর শিক্ষার্থীরা সেই খাতায় তারিখ বসিয়ে জমা দিয়ে ব্যবহারিক অংশে পূর্ণ নম্বর পেয়ে গেলেও কাজিক্ত মানের ব্যবহারিক শিক্ষা থেকে সে পুরাপুরি বাস্তিত হয়েছে। ফলাফল হচ্ছে বিশ্বব্যাপী পিছিয়ে থাকা। তথ্যপ্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্ব যেভাবে তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, প্রতিযোগিতা চলছে এক দেশের সাথে আরেক দেশের। এই প্রতিযোগিতায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির অবস্থান খুঁজে নিতে অনেক কষ্ট হয়।

০৫. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, দাখিল-আলিম স্তরে কমিউনিকেটিভ আরবী এবং ইংরেজি চালু সময়ে পয়োগী হলেও শিক্ষার্থীরা ভাষা শিক্ষার ব্যবহারিক দিক অর্থাৎ Listening, Speaking, Reading And Writing এই চারটি দক্ষতার যথার্থ বিকাশে সফলতা অর্জন করতে পারছে বলে মনে হয়না। এর মূল কারণ শিক্ষক-শিক্ষার্থী এখনো গতানুগতিক অর্থাৎ পুরাতন পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে পারেননি। অধিকন্তু, শিক্ষার্থীদের মাঝে এখনো ইংরেজিতে ও আরবীতে পরীক্ষায় পাস এবং উচ্চতর গ্রেড অর্জনই মূল লক্ষ্য, ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন নয়। তাদের এই ভীতি দূর করতে হবে। ছোট ছোট বাক্য বলা ও তৈরি করার মাধ্যমে ইংরেজি ও আরবী শিখতে পারে। তাদের বুরোতে হবে ইংরেজি ও আরবী ভাষা না জানলে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই অথবা সুযোগ পেলেও বেতন, ভাতাদি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অনেক কম। যোগ্যতম ব্যক্তিরাই সমাজে টিকে থাকবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আধুনিক ও প্রযুক্তিগত ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করাটা অত্যন্ত জরুরী।

০৬. সচেতনতার সাথে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, সর্বক্ষেত্রেই দক্ষ, যুগোপযোগী, মেধাবী কর্মীর বড়ই অভাব। এক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থায় তাত্ত্বিক শিক্ষার চেয়ে ব্যবহারিক শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়াটা বর্তমান সময়ের অন্যতম চাহিদা। পাশাপাশি শিক্ষা গবেষণা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে। মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা অবশ্যই পিছিয়ে পড়ছে। সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করাও দরকার। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য অভিভাবক সচেতনতার পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষায় পাঠদান করাতে হবে। শুধু পরীক্ষার আগে নয়, সারা বছর শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষাগুলোর যথাযথ অনুশীলন করাতে হবে।

উপসংহার: মহান আল্লাহর বাণী ২৮ পারার ০২ পৃষ্ঠায় ‘তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম-জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন।’ (সূরা মুজাদালা : ১১) মানুষের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে মর্যাদা বৃদ্ধিতে এই আয়াতে কারীমা অনুসরণ করা কর্তব্য। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ ব্যবহারিক জ্ঞান শক্তি সম্পন্ন মানবীয় যুগ। এ যুগে ব্যবহারিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। একমাত্র ব্যবহারিক শিক্ষাই দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি বয়ে আনতে পারে। শিক্ষার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধন করা সম্ভব। সাধারণ শিক্ষায় মানসিক বিকাশ ঘটে আর ব্যবহারিক শিক্ষায় সকল দিকে উন্নতি আসে। এভাবে আমরা একটি দেশ, জাতি গঠনে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছতে সক্ষম হতে

পারি। কোনো জাতিকে বিশ্ব দরবারে উন্নত, মর্যাদাশীল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ব্যবহারিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

(খ)

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও নীতি নৈতিকতা চর্চা

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন পরীক্ষায় পাসের হারও বাঢ়ছে। ‘এ প্লাস’ এর ছড়াচার্টিতো আছেই। এটা নিয়ে সত্যিই পুরা জাতির খুশি হওয়া দরকার। কিন্তু বাস্তবতায় ঠিক এর উল্টা দেখা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুক্তে অবর্তীর্ণ হওয়া অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ফল প্রমাণ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে তাদের পড়ালেখা প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের তুলনায় নম্বর অর্জনেই অধিক পরিমাণে সীমাবদ্ধ আছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এ বিশাল দৈন্যতার ভবিষ্যৎ কী? মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বেহাল অবস্থার মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। সব স্তরে নানানভাবে নীতি-নৈতিকতা উপেক্ষিত থাকা একটি রেওয়াজে পরিনত হয়েছে।

সর্বক্ষেত্রে নীতি নৈতিকতা তথা সংগৃহের চর্চা শুধু হাসই পায়নি বরং প্রায় বিপন্ন হতে চলেছে। যেমন একসময় এই সমাজের মানুষই সাধারণত জীবিকা তথা পেশা হিসেবে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, মজুরি ইত্যাদি রীতি ও নীতিসমূহ কর্মপস্থাকেই উপার্জনের একমাত্র উপায় হিসেবে গণ্য করতেন; মিথ্যা বলা, চুরি করা কিংবা অন্যকে ঠকানো এসব কর্মে লিঙ্গ হতেন নেহাত বিপদে পড়ে। যেমন অভাবগত পিতা-মাতা সন্তানের জন্য জীবন রক্ষার্থে অন্ন জোগাড় করার জন্য মিথ্যা বলা, চুরি করা, লোক ঠকানোর মতো গর্হিত কর্মে লিঙ্গ হতেন। বর্তমান সময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, অনেকেই চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি রীতিনীতিসমূহ কর্মই নয় বরং মিথ্যা বলা, চুরি করা কিংবা লোক ঠকানোকেও উপার্জনের মাধ্যম বা পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বজন শ্রদ্ধেয় কিছু কিছু শিক্ষক নারী-কেলেক্ষারী, আর্থিক, মাদক কেলেক্ষারী, ঘৃষ দুর্নীতি সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছেন। অর্থাৎ বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় কাঞ্চিত পর্যায়ে নীতিবান মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে না।

শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনা, আদর্শিক মূল্যবোধ নীতি-নৈতিকতা এবং সজনশীল কর্মতৎপরতা বিকশিত হয়। একটি জাতির কাঞ্চিত উন্নয়নের জন্য, কাঞ্চিত নৈতিক মানসম্পন্ন মানবসম্পদ গড়ে তুলতে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। মানবিক-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে কয়টি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তার অন্যতম দুটি হলো, সুশিক্ষা ও বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা।

সামাজিক মূল্যবোধগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর মাঝে নৈতিকতা চর্চার কোনো বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যেই বর্তমান সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ নৈতিকতা শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

নীতি নৈতিকতা চর্চা

নৈতিকতা কীং নৈতিকতা হলো নীতি সম্পর্কিত বোধ, এটি একটি মানবিক গুণাবলী যা অন্যান্য আরো অনেক গুণের সমন্বয়ে তৈরি হয়। মানুষ তার পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মের উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি খুব সচেতনভাবে মেনে চলে। সমাজ বা রাষ্ট্র আরোপিত এই সব নিয়ম-নীতি ও আচরণবিধি মানুষের জীপন-যাপনকে প্রভাবিত করে। এই নিয়মগুলো মেনে চলার প্রবণতা, মানসিকতা, নীতির চর্চাই হলো নৈতিকতা। নৈতিকতার ভিত্তি হলো মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর আনুগত্য। আর নৈতিকতার প্রধান উৎস হলো আল কুরআন এবং রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ। নৈতিকতার গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলছে, “যে ব্যক্তি নিজের সন্তাকে মহান আল্লাহর অনুগত করে দেবে এবং বাস্তবে সৎ কর্মশীল থাকবে, তার জন্য মহান আল্লাহর নিকট পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোনো ভয় বা দুঃখ নেই।” (সূরা বাকারা : ১১২)

মূলত নৈতিকতা একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের ব্যবহারিক জীবনে প্রতিফলিত হয়। নৈতিকতা নামক এই গুণটি এমনিতেই সৃষ্টি হয় না, এটি অর্জন করতে হয় এবং এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে শিক্ষাব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠানগুলোতে নৈতিকতার থিওরি পড়ানো হয়। কিন্তু বাস্তবে তার কিছুই মানা হয় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতার যে সব পাঠ দেয়া হয় জীবনে তা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিকতার সংঙ্গের ঘটিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব, অনুভূতি জগত করা এবং এ উদ্দেশ্যে তাদের চরিত্রকে আদর্শ ও পবিত্র করে গড়ে তোলা। শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতা গঠনের প্রতি নজর দেয়া হয় না। ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে চলে শুধু একটি মানসম্মত সনদপত্র অর্জনের লড়াই। কেউ একটি গুণগত সার্টিফিকেট লাভ করলে তার মাঝে উপরোক্ত নৈতিক গুণাবলির সমাবেশ না ঘটলেও তাকে সফল শিক্ষার্থী বলে মনে করা হয়। সেটাই হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে যেসব বিষয় সরাসরি সম্পর্কিত সেগুলো হলো সুশাসন, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, দুর্নীতি দমন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি। আচরণে অভীষ্ট ইতিবাচক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধনের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে তথ্য প্রদান বা জ্ঞান দান করাকে শিক্ষা বলে।

নৈতিকতার শিক্ষা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে বলা হয়েছে:

হয়েরত ইব্রাহিম (আ.) দোয়া করলেন: ‘হে আমাদের প্রভু! আপনি তাদের মাঝে পাঠান এমন রাসূল, যিনি আপনার আয়াত উপস্থাপন করবেন, কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী স্নেহশীল ও কৌশলী।’ (সূরা বাকারা, আয়াত: ১২৯)। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে নেতৃত্ব অর্জনে আধ্যাত্মিক গুরুর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ ধরণের গুরুর সান্নিধ্য অর্জন করা অতি জরুরী।

নেতৃত্বার চর্চায় করণীয় বা সৎগুণাবলী অর্জনে পবিত্র ধর্মগুলোর নির্দেশনা-

আত্মিক ও মানবিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন সৎগুণাবলী অর্জন ও ষড়রিপু নিয়ন্ত্রণ। সৎগুণাবলির মধ্যে আছে কৌমার্য, সতীত্ব, শক্তিমত্তা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বোধ, দয়া, মহানুভবতা, পরোপকারিতা, ধৈর্য-সহনশীলতা, মিতাচার বা সংযম ইত্যাদি। ধর্মীয় সৎগুণ তিনটি; যথা (১) বিশ্বাস, (২) আশা ও (৩) ভালোবাসা।

ক) পবিত্র কুরআন শরীকে বলা হয়েছে -

০১. অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই।
০২. ন্যূনতার সাথে কথা বলা।
০৩. বাবা-মা'র সাথে এমন কথা বলা যাবেনা যাতে তাঁরা ‘উফ’ শব্দটি উচ্চারণ করতে বাধ্য হন।
০৪. মধ্যমুষ্ঠি (কৃপণ) হয়েনা, আবার মুক্ত হস্তও হয়েনা বরং মধ্যপঞ্চী হও।
০৫. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করোনা।
০৬. এতিমের সম্পদ আত্মসাং করোনা, এতিমের সম্পদের কাছেও ঘেওনা।
০৭. অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাং করোনা বা কেড়ে নিওনা।
০৮. অনুমান করে কোন কথা বলোনা।
০৯. ব্যাখ্যাকার করোনা।
১০. মানুষ এবং প্রকৃতির প্রতি জুলুম অত্যাচার করোনা।
১১. নিজের স্বার্থ উদ্বারের জন্য কোন দায়িত্বপ্রাপ্তকে ঘুষ দিওনা।

খ) শ্রীমঙ্গবদগীতায় বলা হয়েছে-

- ১। জ্ঞানবান পঞ্জিতেরা (প্রকৃত ধর্মপরায়ন ব্যক্তিরা) বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর ও চতুল সকলের প্রতি সমদর্শী হন।
- ২। যে ব্যক্তি প্রিয় বস্ত্রের প্রাণিতে উৎফুল্ল হন না এবং অপ্রিয় বস্ত্রের প্রাণিতে বিচলিত হন না, যিনি স্থিরবৃদ্ধি মোহশূন্য ও ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা, তিনি ব্রহ্মেই অবস্থিত। (তিনিই প্রকৃত ধার্মিক)।
- ৩। বিবেকবান পুরুষ দুঃখের কারণ এই যে ইন্দ্রিয়জাত বিষয়

ভোগ তাতে আসক্ত হন না। হে কৌন্তেয় (অর্জুন)। এই ধরণের সুখভোগ আদি ও অন্তবিশিষ্ট। তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাতে প্রীতি লাভ করেন না।

৪। এই দেহ ত্যাগ করার পূর্বে যিনি কাম, ক্রোধ থেকে উদ্ভৃত বেগ সহ্য করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং এই জগতে তিনিই সুখী হন।

এই বেগ ছয় প্রকারের- বাচোবেগ, ক্রোধবেগ, মনোবেগ, উদরবেগ, উপস্থবেগ ও জিহ্বাবেগ। যিনি ইন্দ্রিয়ের এই সমস্ত বেগ ও মনকে বশ করতে সক্ষম হয়েছেন, তাকে বলা হয় গোস্মামী অথবা স্বামী (অধ্যায় ৫, শ্লোক : ১৮-২৩)।

গ) বৌদ্ধধর্মে অষ্টাঙ্গিক মার্গ: আট অঙ্গের সমন্বয়ে প্রদর্শিত দুঃখমুক্তির একমাত্র উপায়। (১) সম্যক দৃষ্টি: চার আর্যসত্য: ১. জীবন দুঃখময় ২. দুঃখের কারণ আছে ৩. দুঃখের নিবৃত্তি আছে এবং ৪. দুঃখ নিরোধের উপায় আছে। দ্বাদশ নিদান: দ্বাদশ নিদান: ১. আবদ্যা ২. সংক্ষার ৩. বিজ্ঞান ৪. নামরূপ ৫. ষড়ায়তন ৬. স্পর্শ ৭. বেদনা ৮. তৃষ্ণা ৯. উপাদান ১০. ভব ১১. জাগিত বা জন্ম ১২. জরা মরণের আবর্তে চলছে ভবচক্র (১ ও ২ অতীত জীবনের ৩-১০ বর্তমান জীবনের ১১ ও ভবিষ্যত জীবনের) প্রতীচ্য-সমৃৎপদ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান। (২) সম্যক সংকল্প: কাম, হিংসা ও প্রতিহিংসাবিহীন নিষ্কাম, মৈত্রী ও করুণার সংকল্প। (৩) সম্যক বাক্য: মিথ্যা, কৃৎসা, কৃট ও বৃথা বাক্য থেকে বিরত হয়ে সত্যপ্রিয়, মিষ্ট ও অর্থপূর্ণ বাক্য কথন। (৪) সম্যক কর্ম: প্রাণী হত্যা, চুরি ব্যভিচার ও মাদক থেকে বিরত হয়ে সত্য দয়া ও বদান্যতা প্রদর্শন এবং চরিত্রবান থাকার কর্ম। (৫) সম্যক জীবিকা: মিথ্যা জীবিকা পরিহার করে সৎ জীবিকা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। (৬) সম্যক উদ্যম: ইন্দ্রিয় সংযম, কুচিষ্ঠা পরিত্যাগ ও সুচিষ্ঠা উৎপাদন এবং এর স্থিতি ও বৃদ্ধির চেষ্টা। (৭) সম্যক স্মৃতি: কায় বেদনা, চিন্তা ও মানসিক ভাবসমূহের প্রকৃত স্মৃতি, এ সবের মালিন্য, ক্ষণ ভঙ্গুরতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে সর্বদা সতর্ক থাকা। (৮) সম্যক সমাধি: কাম ও অকুস্তল চিন্তা থেকে বিরত হয়ে চিন্তের একাগ্রতা সাধন। সম্যক সমাধি মনের বিক্ষেপ দুর করে।

নেতৃত্বার চর্চায় বর্জনীয় ও নিন্দনীয় বিষয়সমূহ

বর্জনীয় বিষয় হলো ষড়রিপু বা কুপ্রবৃত্তিসমূহ। যথা (১) কাম, (২) ক্রোধ, (৩) লোভ, (৪) মোহ, (৫) মাদক এর ব্যবহার ইত্যাদি। সাধারণত মানুষের মধ্যে ১০টি সৎগুণ ও ১০টি বদগুণ বিদ্যমান থাকে। পরিভাষায় এগুলোকে রজায়িল (কুপ্রবৃত্তিসমূহ) ও ফাজায়িল (সুকুমারবৃত্তি) বলা হয়। মানুষের উচিত বদগুণ বর্জন ও সৎগুণ অর্জনের মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জন করা। এ ছাড়া কিছু উত্তম বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অর্জন করা মানুষের জন্য বাঞ্ছনীয় ও প্রশংসনীয় এবং কল্যাণের পথে সহায়ক।

কুপ্রবৃত্তিসমূহ হলো (১) হিরচ (লোভ), (২) তমা (লালসা),

(৩) রিয়া (প্রদর্শনের ইচ্ছা), (৪) কিবর (অহংকার), (৫) কিজব (মিথ্যা), (৬) গিবত (পরনিন্দা), (৭) হাতাদ (হিংসা), (৮) উজব (অহমিকা), (৯) কিনা (পরশ্চীকাতরতা) ও (১০) বুখল (কৃপণতা)।

সুকুমার বৃত্তিসমূহ- ফাজায়িলগুলো হলো (১) তাওবা (গুনাহের জন্য অনুত্তাপ করা, ক্ষমা চাওয়া), (২) ইনাবাত (আল্লাহর দিকে মন সর্বদা রঞ্জু রাখা), (৩) জুহু (দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত আশা পরিত্যাগ করা), (৪) অরা (সন্দেহজনক জিনিস থেকে বেঁচে থাকা), (৫) সবর (ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা), (৬) শোকর (কৃতজ্ঞতা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা), (৭) তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হওয়া), (৮) তছলিম (মহান আল্লাহর হৃকুম-আহকাম/নিয়ামত ও মুসিবত সন্তুষ্টিচিত্তে মেনে নেওয়া এবং আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা), (৯) রেজা (আল্লাহর ইচ্ছার ওপর রাজি থাকা), (১০) কানাআ'ত (অত্তে তৃষ্ণি)।

নৈতিকতা চর্চায় পিতা, মাতা ও অভিভাবকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর বা সন্তানের নৈতিক শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উৎস হলেন তার পিতা, মাতা ও অভিভাবকেরা। তাঁদের জীবন ও কর্ম পোষ্য বা সন্তানের জীবনে সরাসরি প্রতিফলিত হয়। তাঁরা যদি সৎ ও সুন্দর পরিশীলিত চরিত্র ও মার্জিত আচরণের অধিকারী হন, সন্তানেরা দেখে দেখেই তা আয়ত্ত করে। নৈতিকতার চর্চায় শিক্ষক মহোদয়গণ হলেন শিক্ষার্থীর জীবনের প্রধান প্রভাবক। শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষক হলেন হিরো (নায়ক) বা আইকন (মডেল)। তাই শিক্ষককে হতে হবে শিক্ষার্থীর রোল মডেল বা আদর্শের বাস্তব নমুনা।

উপসংহার: একটি জাতির নীতি-নৈতিকতার চর্চা সেই জাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক গতি-প্রকৃতি ও অবস্থানকে তুলে ধরে। যে জাতি যতো বেশি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নিজস্ব মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সে জাতি ততো বেশি সুসংহত। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ মানুষকে ন্যায়ের পথে, কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। অন্যায়-অবিচার করা থেকে মানুষকে দূরে রাখে। যে ব্যক্তি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত, যে নিজের মূল্যবোধকে সম্মান করে সে ব্যক্তি সর্বদাই নিষ্কলুষ থাকে। এক্ষেত্রে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মানসিক মূল্যবোধ, দেশাত্মোধ ও ক্ষমাশীলতা জাহ্নত করতে পারে। তাদের মধ্যে শুঁজুলা, ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশীলন, সামাজিক দায়িত্ব পালনে আগ্রহী করে তুলতে হবে। মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটানো শিক্ষকের বড় দায়িত্ব। তাদের নিজেদের সন্তানদের মতো মনে করে শিক্ষা দিতে হবে। পিতা-মাতাকে সন্তানদের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় নীতি শিখাতে হবে। তাদের প্রতি সজাগ থাকতে হবে। তারা যেন অসৎ সঙ্গী থেকে দূরে থাকে। তা না হলে বিপদগামী হবে। পরে আর সংশোধনের সুযোগ থাকবে না। মাঝাস্মালাম ও ধন্যবাদান্তে

ডষ্টর আলহাজ্জ হাফেজ কুরী আল্লামা মুহাম্মদ মহিউল হক সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ.কে. (এইচএম; এমএম; এমএ; এমবিএ; এসটিসি; কম্পিউটার ডিপ.)

আইভিএলপি- ইউএসএ, মাইক্রোসফট ফেলো, এক্সপার্ট এডু.

অধ্যক্ষ, নজিরিয়া নঙ্গিয়া মাহমুদিয়া ফাযিল (ডিগ্রী) মাদরাসা খতিব- আফজল মাবির পাড়া শাহী জামে মসজিদ

01554-314744 E-mail: hmhoq@live.com

[SZHM Trust এর উদ্যোগে ১০ মাঘ উপলক্ষ্মে ১০দিনব্যাপি কর্মসূচীর পঞ্চম দিনে ১৮ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার ২০১৮ গাউহিসংয়া হক মন্ডিল মাইজভাণ্ডার শরিফ অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমাবেশে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত]

সুফি উদ্ধৃতি

- কুম্ভাবাপন্ন আলিম অপেক্ষা
সুম্ভাবাপন্ন ফাসিকের সাহচর্য উত্তম।
- আল্লাহর নিয়ামত ও স্বীয় অপরাধের
কথা চিন্তা করলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়
তা-ই লজ্জা।
- স্বীয় ইখতিয়ারকে দূর করে আল্লাহর
ইচ্ছার উপর নিজেকে সোপর্দ করার
নাম রোজা।
- তাওবার অবস্থা তিনটি। যথাঃ (১)
আল্লাহর নিকট লজ্জিত হওয়া, (২)
পাপ কাজ বর্জন করার দৃঢ় সংকল্প করা,
আর (৩) জুলুম ও ঝগড়া থেকে
নিজেকে পাক রাখা।
- সত্যবাদীর নাম হল সততা। যে
ব্যক্তিকে কথায়, কাজে সৎ দেখা যায়,
সে-ই সিদ্ধীক।

-হ্যরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)

তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরিফ এবং বেলায়তে মোতলাকার উৎস সন্ধানে • জাবেদ বিন আলম •

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হ্যরত ওয়ায়েস করণী (রহঃ)

১. মহানবী (দঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে পরম আত্ম্যাগ, সুউচ্চ নৈতিকতা এবং প্রচঙ্গ বিবেক বোধের ভিত্তিতে মানুষের ধর্ম হিসেবে পৃথিবীবাসীর নিকট সুগভীর শেকড় সমৃদ্ধ ইসলাম নামের যে বিশাল বৃক্ষ প্রোথিত হয়েছিল, উমাইয়া রাজবংশের শুরুতে অনৈতিক, চরম বৈষয়িকতা এবং অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম নির্দেশিত জীবন বিধানের বিপরীতধর্মী কার্যকলাপের কারণে সে বৃক্ষ শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন ইসলাম ধর্মের নামে শেকড়বিহীন আনুষ্ঠানিকতা ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে। ধর্মাচারের নামে আনুষ্ঠানিকতা বেগবান হলেও মিথ্যা, কপটতা, ভগ্নামি, হিংসা, বিদ্বেষ, বিদ্রূপতাব এবং নিষ্ঠুরতা লালন করে ইসলাম ধর্মের নৈতিক শক্তিকে দুর্বল করে ফেলা হয়। শাসকের বিলাসবহুল আরাম-আয়েশের জীবন এবং হেরেম খানার হারামের জিন্দেগীর প্রভাব জনমানসে ক্রমান্বয়ে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এর ফলে সর্বত্র লোভ ও ভোগবাদী জীবনধারা সচল হয় এবং ইহকালীন সুখ-সন্তোগ প্রাধান্যে এসে যায়। এ ধরনের জীবন বোধ আল-কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ আছে। রাষ্ট্র ক্ষমতা এবং সামাজিক শক্তিসমূহের অপযাত্রা বিষয়ে পূর্ব থেকে জ্ঞাত ছিলেন বিধায় মহানবী (দঃ) তাঁর সাহাবাদের ইয়েমেনবাসী হ্যরত ওয়ায়েস করণীর (রহঃ) সংবাদ অবহিত করেছিলেন। মহানবীর (দঃ) নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে আমীরুল মোমেনীন হ্যরত উমর ফারুক (রাঃ) এবং আমীরুল বেলায়ত হ্যরত আলী (রাঃ) যৌথভাবে হ্যরত ওয়ায়েস করণী সমীপে উপস্থিত হয়ে ছিলু (দঃ) প্রদত্ত খেরকা মোবারক পেশ করেন। উল্লেখ করা বাস্তিত যে হ্যরত ওয়ায়েস করণী (রহঃ) আত্মিক পরিপূর্ণতার এমন এক স্তরে উপনীত হন যে আল্লাহ এবং রাসূলের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্তের প্রেম নিবেদনের কারণে কোন প্রকার বিনিময় প্রত্যাশা করতেন না। উট ঢালনোর বিনিময়ে প্রাপ্ত পরিশ্রম লক্ষ অর্থের মাধ্যমে তিনি জীবন ধারণ করতেন। ফলে ছিলু (দঃ) কর্তৃক প্রেরিত পবিত্র খেরকা গ্রহণের সময় তিনি অত্যন্ত বিন্দু এবং লজ্জিত হয়ে পড়েন। এমন কি তিনি যে মহানবী

(দঃ) আদিষ্ট ব্যক্তি নন তা উল্লেখ করে নিজেকে গোপন রাখতে চেষ্টা করেন। খেরকা গ্রহণের পর পরিধানের পূর্বে তিনি মহানবীর (দঃ) নির্দেশ অনুযায়ী গুণাহগার উমাতে মুহাম্মদীর পাপ মোচনের জন্য দোয়া করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর আর্জি কবুল না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ছিলু (দঃ) প্রেরিত পবিত্র খেরকা অঙ্গে ধারণ না করার অনড় অবস্থান নিয়ে হ্যরত ওয়ায়েস করণী (রহঃ) আল্লাহর দরবারে সিজদা রত থাকেন। সিজদায় হ্যরত ওয়ায়েস করণীর (রহঃ) সঙ্গে কথোপকথন চলেছে অদৃশ্য ভাণ্ডারের মহান প্রতাপশালী-মালিক, মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাবুল আলামীনের সঙ্গে। এটা মূলতঃ বেলায়তের রহস্য।

২. দ্বিতীয় খলিফা হ্যরত উমর ফারুক (রাঃ) হ্যরত ওয়ায়েস করণীর (রহঃ) কর্মকাণ্ড অবলোকন করে প্রত্যক্ষ করেন যে ছিলু কম্বল পরিহিত দরবেশ হ্যরত ওয়ায়েস করণীর (রহঃ) নিকট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অমূল্য সম্পদ বিদ্যমান। হ্যরত ওয়ায়েস করণীর (রহঃ) সামগ্রিক অবস্থা দর্শনে অভিভূত হয়ে ছিলু পরিচালনার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও হ্যরত উমর ফারুকের (রাঃ) প্রেমাবেগ এতোই প্রবল হয়ে উঠে যে তিনি বলে উঠেন, “ওহে এমন কে আছে যে একটি রুটির বিনিময়ে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।” হ্যরত উমর ফারুকের এ ধরনের উপলক্ষ্মি সম্পর্কে মুত্তাকীদের অভিমত হচ্ছে, “বেলায়তের অধিকার খেলাফত থেকে বহু উত্তম।”

৩. বেলায়ত সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্য হ্যরত ওয়ায়েস করণীর (রহঃ) কিছু বাণী অনুধাবন করা অতীব প্রয়োজন। হ্যরত ওয়ায়েস করণী (রহঃ) উল্লেখ্য করেন, “যদি তুমি আসমান ও জমিন তুল্য ইবাদত কর কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি সুদৃঢ় আস্থা না থাকে, তবে তা কবুল হবে না। সব বিফলে পর্যবসিত হবে। হ্যরত ওয়ায়েস করণী (রহঃ) বলেছেন, তোমার নিকট যা আছে অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন, তুমি তাতেই তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকবে। অন্য কোন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হবে না।” তিনি উল্লেখ করেন, “তিনটি বস্তু যে বেশী ভালবাসে দোজখ তার কষ্ট থেকেও নিকটবর্তী। যথা; (১) সুখাদ্য (২) উত্তম পোশাক (৩)

আমীর-ওমরাহহের মোসাহেবী।” হ্যরত ওয়ায়েস করণীর মতে, “তাওহীদ বা একত্ববাদের মধ্যেই শান্তি। অর্থাৎ অন্তরে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো স্থান যেন না হয়।”

হ্যরত ওয়ায়েস করণীর মতে, “উচ্চ মর্যাদার আকাঞ্চ্ছা ছিল, বিনয়ের মাধ্যমে তা লাভ করেছি। গৌরবের আকাঞ্চ্ছা ছিলাম, দারিদ্র্যার মধ্য দিয়ে তা অর্জিত হয়েছে। নেতৃত্ব লাভের আশা ছিল, সত্যের ভিতরে তা পেয়েছি। আভিজাত্যের বাসনা ছিল, খোদা ভীতির মধ্য দিয়ে তা পেয়েছি। মহত্ত্ব লাভের আকাঞ্চ্ছা সফল হয়েছে তুষ্টির মাধ্যমে। আর নির্ভরতার সন্ধান করতঃ তা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে অর্জন করেছি। হ্যরত ওয়ায়েস করণী (রহ)’র বাণীসমূহ তাসাওউফ শাস্ত্রের প্রাণ। তাঁর অর্জন সমূহে ইবাদত, নির্জন সাধনা এবং মাত্সেবার ফখর নেই। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে স্বচক্ষে না দেখেও অতুলনীয় রাসূল প্রেম এবং প্রতিটি মুহূর্তের বিষয়াদি সম্পর্কে ঐশ্বী নির্দেশনা অবহিত থাকার কারণে শুধু তাসাওউফ জগতে নন, সমগ্র মানব জগতে তাঁর মর্যাদা ও সম্মান বিস্ময়কর অবস্থানে বিদ্যমান আছে। তাঁর অন্তর্চক্ষু আল্লাহর নির্দেশনার প্রতি সর্বক্ষণ এতো একান্ত এবং উদ্গীব থাকত যে মুহূর্তের খবর তিনি আল্লাহপাক থেকে জ্ঞাত হতেন। হ্যরত হারম ইবনে জাবান (রহঃ) যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে যান তিনি দেখামাত্র তাঁর নাম উচ্চারণ করেন। হ্যরত হারম ইবনে জাবান (রহঃ)’র সঙ্গে কথোপকথনের এক পর্যায়ে তিনি পৃথিবী থেকে হ্যরত উমর ফারঢ়কের বিদায় গ্রহণের সংবাদও জানিয়ে দেন।

৪. লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে হ্যরত ওয়ায়েস করণীর (রহঃ) সাধনা পদ্ধতি এবং ঐশ্বী প্রেমধারা অনুশীলন করে এখনো অনেক অলি আল্লাহ অতি সংগোপনে জনসমাজে বিচরণ করে থাকেন। এ ধরনের অলি আল্লাহগণ প্রধানত প্রকাশ ও প্রচার বিমুখ হন। ঐশ্বী প্রয়োজনে প্রাণ বিসর্জনের লক্ষ্যে তাঁরা সদা প্রস্তুত থাকেন। তাদের বিষয়ে লোকায়ত কাহিনী গড়ে ওঠে, অথচ কোন প্রকার স্মৃতি সৌধ বা মাজার গড়ে ওঠার ব্যাপারে তাঁরা আঘাত বিমুখ হন। হ্যরত ওয়ায়েস করণী (রহঃ) মহানবীর (দঃ) খেরকা (বেলায়তের খেরকা) আমীরুল মোমেনীন হ্যরত উমর ফারঢ়ক এবং হ্যরত মওলা আলী (রাঃ) থেকে গ্রহণ করেন। গহীন অরণ্যে এ খেরকা প্রদানকালে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় এবং বেলায়ত উভয় পদের শীর্ষতম দু’ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। এ ঘটনায় বেলায়তের ঐশ্বী ধারার সঙ্গে খেলাফতের ঐশ্বী সংযোগের ফলিত রূপের

আবশ্যকতা প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলাম ধর্মে ইবাদত এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন এক এবং অভিন্ন।

হ্যরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)

হ্যরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) হলেন মহানবীর (দঃ) উম্মাহর মাথার মুকুট, শ্রেষ্ঠ আদর্শ পুরুষ, সত্য ও সততার মূর্ত্ত প্রতীক। তিনি প্রধান ওয়ারেসে নবুবী, আহলে বাইতের দ্বাদশ ইমামের অন্যতম একজন, আউলিয়া-আবদালের মধ্যমণি, শেরে খোদা মওলা আলীর (রাঃ) বংশের গৌরব, সর্বোপরি গাউসিয়তের পবিত্র নূরের ধারাবাহিক সংরক্ষক এবং হেফাজতকারী। হ্যরত ইমাম জাফর সাদেক হলেন শোহাদায়ে কারবালার ইমাম, হক এবং ইনসাফের পক্ষে শাহাদত বরণকারী, জালেমের বিরুদ্ধে নিরাপোষ সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী হ্যরত ইমাম হোসাইনের (রাঃ) পৌত্র এবং ইমাম জয়নুল আবেদীনের পুত্র। তাঁর প্রসিদ্ধ নাম ইমাম বাকের (রঃ)। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সুস্মৃতা উপলক্ষিতে অত্যন্ত পারঙ্গম এবং আল্লাহর কিতাবের সৃষ্টি ইঙ্গিতসমূহ বর্ণনায় পারদর্শী।

লোক সমাজ থেকে দূরে থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আল্লাহর ইবাদতে সর্বক্ষণ মশগুল থাকা সত্ত্বেও তিনি সাধারণ মানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আহলে বাইতে রাসূল (দঃ) এর উত্তরাধিকার হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের অকৃষ্ট শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় তিনি সর্বদাই সিঙ্গ হতেন। সে সময় তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা এবং তাঁর প্রতি জনগণের ভক্তিপূর্ণ আকর্ষণ দেখে আবাসীয় শাসক মনসুর বিল্লাহ নিজের ক্ষমতা এবং পদ-পদবী সম্পর্কে শংকিত হয়ে ওঠেন। এমতাবস্থায় ওয়ারেসে নবুবী এবং বেলায়তের উত্তরাধিকারী মহান ব্যক্তিত্ব হ্যরত ইমাম জাফর সাদেককে (রহঃ) আবাসীয় বাদশাহ মনসুর বিল্লাহ তাঁর ক্ষমতার একমাত্র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে চিহ্নিত করে হত্যার উদ্যোগ নেন। মনসুর বিল্লাহ ভাষায় ‘অকল্যাণ’ অপসারণার্থে হত্যা করার লক্ষ্যে একদিন উজীর মারফত হ্যরত ইমাম জাফর সাদেককে (রহঃ) রাজ দরবারে দেকে পাঠান। মনসুর বিল্লাহ সে সময় উপস্থিত সভাসদ এবং কোতোয়ালকে ইমামকে (রঃ) হত্যার পরিকল্পনা এবং নির্দেশনা বিষয় অবহিত করেন। যথাসময়ে হ্যরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) উপস্থিত হলে মনসুর বিল্লাহ তাঁকে হত্যার নির্দেশ প্রদানের পরিবর্তে স্বীয় আসন ছেড়ে ওঠে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। মনসুর বিল্লাহ ইমামকে (রহঃ) নিজের পাশে বসিয়ে বলেন, “আমি

আপনাকে এখানে আসার জন্যে কষ্ট দিয়েছি বলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অতঃপর কিছু কথোপকথনের পর সম্মানের সাথে ইমাম জাফর সাদেককে (রহঃ) বিদায় দেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মনসুর বিল্লাহ ইমামকে (রহঃ) যে কোন প্রকার সাহায্য করতে ইচ্ছা পোষণ করলে তা তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, “আপনার কাছ থেকে আমার কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। তবে ভবিষ্যতে আমাকে আর কখনো আপনার দরবারে ডাকবেন না।” মনসুর বিল্লাহ ইমামকে (রহঃ) ভবিষ্যতে না ডাকার প্রতিশ্রূতি দিয়ে অত্যন্ত সম্মানসহকারে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় দেন। রাজ দরবার থেকে ইমামের (রহঃ) প্রস্তানের পরেও মনসুর বিল্লাহর কক্ষে গ্রীষ্মী ক্ষমতার তেজঞ্জিয়তা বিরাজমান ছিল। এতে মনসুর বেহশ হয়ে পড়েন। চেতনা আসার পর উপস্থিত সভাসদরা হত্যার পরিবর্তে হ্যরত ইমাম জাফর সাদেকের (রহঃ) প্রতি বিন্দু শুন্দা প্রদর্শনের কারণ মনসুর বিল্লাহ থেকে জানতে চান। তখন বাদশাহ মনসুর বিল্লাহ উল্লেখ করেন, “যখন ইমাম জাফর সাদেক কক্ষে প্রবেশ করেন তখন আমি দেখতে পেলাম ভীষণ তিণটি বিষধর সাপ ফনা উঁচু করে আমাকে বলে, দেখ মনসুর! জাফর সাদেকের কোন অনিষ্টের চেষ্টা করলে আমরা তোমাকে দংশন করব।” অন্য বর্ণনায় আছে ইমাম জাফর সাদেকের (রহঃ) ডান ও বাম পাশে দুটি ভয়ঙ্কর বাঘ ঘোষণা করছে, “মনসুর তুমি যদি তাঁর (ইমাম রহঃ) কোন প্রকার ক্ষতি কর, তাহলে আমরা তোমাকে ফেঁড়ে খেয়ে ফেলব।” তাই ভয়ে শংকিত হয়ে আমি জাফর সাদেকের সঙ্গে বিন্দু ব্যবহার ও সদাচার করেছি।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রয়োজনীয় হেফাজতের জন্য অনেক সময় সৃষ্টির বিভিন্ন জীব, জন্ম, প্রাণিকেও নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। দোর্দঙ প্রতাপের আবাসীয় শাসক মনসুর বিল্লাহ মৃত্যুর পর গণ আগ্রেশ এবং চরম অর্যাদা থেকে স্বীয় কবরকে সংরক্ষণের নিমিত্তে একশতটি কবর খনন করে একটিতে দাফন করে নির্দিষ্ট কবরকে অনিন্দিষ্ট করে ফেলার নির্দেশ দেন এবং তা বাস্তবায়িত হয়। মহান আল্লাহ এ ধরনের ঘটনা থেকে মানবজাতিকে শিক্ষা নেবার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বিজয় কেতন তাঁদের ওফাতের পর মাজার শীর্ষে চিরকালের জন্য উড়ীন থাকে। সর্বাবস্থায় তাঁরা জননন্দিত হয়ে পৃথিবীর বুকে অমর থেকে যান। অন্যদিকে দুঃশাসকের দাঙ্গিকতা মৃত্যুর পর ঘৃণাভরে নিন্দিত হয় এবং সর্বাবস্থায় জনগণের নিকট থেকে অভিশাপ প্রাপ্ত

হয়।

হ্যরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)- এর অনন্য বাণীসমূহের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে (ক) মুক্তি ঘটে আমলের দ্বারা বংশের দ্বারা নয় (খ) খোদা প্রদত্ত গৌরবে গৌরব বোধ করা অহমিকা নয় (গ) জ্ঞানীর সংজ্ঞা হচ্ছে যে ব্যক্তি দুটি ভালো কাজের মধ্যে সর্বোত্তমটি গ্রহণ করে এবং অসুবিধাজনক অবস্থায় (ওজর) দুটি খারাপ কাজের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপটি গ্রহণ করে তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। তাঁর মতে, আল্লাহর জিকিরের অর্থ হলো, আল্লাহর স্মরণ করতে গিয়ে অন্য যে কোন বস্তুকে একেবারে ভুলে যাওয়া। তিনি পাঁচ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সংস্কৰ না রাখার নির্দেশনা দেন। এগুলো হচ্ছে (১) মিথ্যাবাদী (২) কৃপণ ব্যক্তি (৩) নির্দয় ব্যক্তি (৪) কাপুরুষ এবং (৫) ফাসেক।

ইমাম জাফর সাদেকের (রহঃ) সময়কাল ছিল উমাইয়া-আবাসীয়দের যুগপৎ পতন এবং উত্থানকালীন পরিবেশকাল। ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) গভীর রাতে আল্লাহর দরবারে উচ্চস্থরে কান্না করে বলতেন, “হে মাবুদ! হে আমার প্রভু! রাত আগমন করেছে, দুনিয়ার বাদশাহদের কর্মতৎপরতা থেমে গেছে। আকাশে তারকা দেখা দিয়েছে। সমস্ত জগত সুপ্ত, যেন জনমানবহীন এ পৃথিবী। মানুষের কোন সাড়া শব্দ নেই। চোখ নির্দিত। বনী উমাইয়াও আরামের কোলে শায়িত। তারা তাদের মূল্যবান সম্পদ লুকিয়ে রেখেছে। এবং তাদের কাছ থেকে স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারীর দল তাদের আশা ত্যাগ করে চলে গেছে। কিন্তু তুমি! হে আমার প্রভু! তুমি জাগ্রত, তুমি চিরজীব, তুমি মহাজ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞাত। নির্দা ও তন্দ্রা তোমার নেই। এটি তোমার প্রকৃতি নয়। যে ব্যক্তি তোমার এ গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ, সে তোমার নিয়ামত পাওয়ার যোগ্য নয়। হে প্রভু! তুমি এমনি এক সত্তা যার কাজে কেউ কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনা। রাত ও দিন উভয়ই যার নিকট সমান। তোমার রহমতের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত। তোমাকে আহ্বানকারী, তোমার প্রশংসাকারী কখনো তোমার দ্বার হতে শূন্য হাতে ফিরে আসে না। যমীন ও আসমানের যা কিছু যে তোমার নিকট কামনা করে, সে তা থেকে বঞ্চিত হয় না।

হে আল্লাহ! যখন মৃত্যুর ভয়াবহতা, কবরের আয়াব এবং হিসাবের কথা মনে পড়ে, তখন কিভাবে আমি এ দুনিয়ায় হাসি মুখে থাকতে পারি? যখন মৃত্যুর ফিরিশতার কথা স্মরণ করি তখন দুনিয়া থেকে কিভাবে উপকার লাভ করব? আমি সমস্ত কিছুই তোমার নিকট কামনা করছি। তোমাকেই

একমাত্র মাবুদ বলে বিশ্বাস করি। মৃত্যুর সময় তুমি আমাকে এমন আনন্দ দান করো যাতে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়। হিসাবের সময় এমন প্রফুল্লতা দান করো যাতে সমস্ত ভয়-ভীতি লাঘব হয়ে যায়।

আহলে বাইতের পবিত্র উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কান্নাকাটি দেখে খাদেম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে হ্যরত ইমাম জাফর সাদেক উল্লেখ করেন, “হ্যরত ইয়াকুব (আঃ) এক ছেলে হারিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অঙ্গ হয়ে গেছেন। আর আমি স্বীয় পিতা হ্যরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) সহ আঠারজন আপন লোক হারিয়েছি। তাই আমার প্রভু সমীপে সর্বক্ষণ ফরিয়াদ করা থেকে কিভাবে বিরত থাকতে পারি।”

এটি অনস্বীকার্য যে, আহলে বাইতের পবিত্র শোণিত ধারা বেয়ে মহান আল্লাহর ত্রাণ কর্তৃত্বের (গাউসুল আয়ম) উচ্চ ও বিকাশ ঘটেছে। ‘গাউসুল আয়ম’ পদবীধারী মহান ব্যক্তিত্বের তৃরিকতের ধারাও এটি।

হ্যরত হাসান বসরী (রহঃ)

হ্যরত হাসান বসরীর (রহঃ) জন্ম পবিত্র মদিনায়। তাঁর মাতা ছিলেন উম্মাহাতুল মোমেনীন হ্যরত সালমা (রাঃ) এর প্রিয় পরিচারিকা। তাই হ্যরত হাসান বসরীর (রহঃ) শৈশব কেটেছে মহানবীর (দঃ) পবিত্র গৃহে হ্যরত সালমা (রাঃ) এবং হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকার (রাঃ) আপত্য স্নেহে। তিনি মহানবীর (দঃ) পবিত্র ক্ষেত্রে উঠার পরম সৌভাগ্য অর্জন করেন। হ্যরত হাসান বসরী (রহঃ) বেলায়তের সন্তান হ্যরত মওলা আলীর (রাঃ) নিকট ইলমে তৃরিকতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি হ্যরত আলীর (রাঃ) একজন পৃথিবীর শিষ্য। কঠোর-কঠিন রিয়াজতের মাধ্যমে তিনি আধ্যাত্মিক মহাপুরুষে পরিণত হন। হ্যরত হাসান বসরী ছিলেন সুবক্তু। প্রতি শুক্রবার বাদ জুমাহ তিনি ভক্ত-শিষ্য এবং তাসাওউফ বিশ্বাসীদের মজলিসে বক্তৃতা করতেন। এ মজলিসে পৃথিবী খ্যাত তাপসী হ্যরত রাবেয়া বসরী (রহঃ) অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত থাকতেন। কোন কারণে হ্যরত রাবেয়া বসরী (রহঃ) অনুপস্থিত থাকলে হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) সেদিন বক্তৃতা করা থেকে বিরত থাকতেন। কারণ হ্যরত হাসান বসরীর (রহঃ) সুউচ্চ মার্গের আধ্যাত্মিক বক্তৃতা হ্যরত রাবেয়া বসরী (রহঃ) সহজে হৃদয়ঙ্গম করতেন। হ্যরত হাসান বসরী (রহঃ) হলেন- অসংখ্য কারামত প্রদর্শনকারী আউলিয়া। আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেন, আমি চারজন লোকের নিকট খুবই অপ্রস্তুত থেকে শিক্ষা লাভ করেছি। তাদের একজন হিজরা, দ্বিতীয়জন-

মাতাল, তৃতীয়জন বালক এবং চতুর্থজন মহিলা।” একবার হ্যরত হাসান বসরী (রহঃ) এক হিজরার পরিহিত কাপড় ধরে আকর্ষণ করায় সে বলে ওঠে, “জনাব! আমার গোপন রহস্য বাইরে এখনো প্রকাশ পায়নি, আপনি কি তা প্রকাশ করে দিতে চান।” তৃরিকতপন্থীদের জন্য এটি হচ্ছে কারো কোন গোপন বিষয় প্রকাশ না করার নির্দেশনা। দ্বিতীয়বার তিনি এক মাতালকে রাস্তায় হেলে দুলে চলতে দেখে বলে ওঠেন, “ওহে! পথ পিছিল, সাবধানে পা ফেল, নতুবা আছাড় খাবার আশংকা আছে।” হ্যরত হাসান বসরীর (রহঃ) এ ধরনের সাবধান বাণীর প্রত্যুভাবে মাতাল বলে ওঠে, “তুমি তোমার নিজের পা দুটো ঠিকভাবে ফেলে চলো। আমি তো মাতাল। আছাড় খেলে কিন্তু ক্ষতি হবে না। নিজের কাপড়ে কিছু কাদা লাগলে তা ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব। কিন্তু তুমি বড় এক আউলিয়া। তোমার অসংখ্য শিষ্য-শাগরেদ আছে। এরা তোমার উপর ভর করে চলে। যদি চলার পথে তুমি আছাড় খাও, তোমার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সবার একই অবস্থা হবে। কাজেই পথ চলার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে তোমাকে অধিক সতর্ক থাকতে হবে।” একটি বালকের ঘটনাটি ছিল অভিনব। একদা এক বালক একটি জ্বালানো প্রদীপ হাতে নিয়ে চলছিল। হ্যরত হাসান বসরী (রহঃ) তাকে বললেন, “বালক তুমি এ আলো কোথা থেকে আনলে।” বালকটি হঠাৎ প্রদীপটি নিভিয়ে দেয়। তখন বালকটি তাঁকে বলল, “আপনি বলুন এখন আলো কোথায় চলে গেল? তারপর বলব আমি কোথা থেকে আলো এনেছি।” চতুর্থ ঘটনা বর্ণনাকালে হ্যরত হাসান বসরী (রহঃ) উল্লেখ করেন, “একদা এক সুন্দরী মহিলাকে দেখলাম অনাবৃত মন্তকে দ্রুত কোথায় যেন ছুটে চলেছে।” তিনি মহিলাকে মন্তক আবৃত করে পথ চলতে বলেন। জবাবে মহিলা উল্লেখ করেন, দেখুন মহাত্মন! আমি আমার স্বামীর বিচ্ছেদের কারণে দিশেহারা হয়ে গেছি। আমার অন্যকোন দিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। কিন্তু আমি আশ্চর্য হই আপনার ব্যাপারে। আপনি আল্লাহর অলি। আপনার আল্লাহর প্রতি এতো বেশি মহবত। অথচ দেখছি আপনার সবকিছু স্বাভাবিক। আল্লাহর প্রেমের দাবিদার হয়ে আপনি কে কিভাবে চলছে তাও লক্ষ্য রাখেন! এ তো আশ্চর্য বটে। প্রেমের মাতোয়ারা ব্যক্তির পক্ষে এটি কি করে সম্ভব। হ্যরত হাসান বসরীর (রহঃ) উপর্যুক্ত বিবরণী আল্লাহ অব্বেষণকারীদের জন্য সতর্কতামূলক পথ বিন্যাস। হ্যরত হাসান বসরী (রহঃ) কঠিন মাস'আলা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য অনেক সময় আহলে বাইত হ্যরত ইমাম

হাসান (রাঃ) সমীপে পত্র লিখতেন অথবা হাজির হতেন এবং শিক্ষা নিতেন। তিনি প্রায়শঃ হ্যরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর সংস্পর্শে গিয়ে তৃরিকত সম্পর্কিত বিভিন্ন জ্ঞান আহরণ করতেন।

হ্যরত হাসান বসরী (রহঃ) ছিলেন অমিতজ সাহসী আউলিয়া। পার্থিব বিষয়ে তিনি ছিলেন অনীহ। তাঁর মতে এক পলক দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি হাজার বছরের ইবাদত অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। হ্যরত হাসান বসরী বলেছেন, দুনিয়াদার লোক তিনটি আক্ষেপ নিয়ে মৃত্যুবরণ করে, (ক) ধনোর্পাজন ও ধন সঞ্চয়ের বিষয়ে অত্প্র থাকা; (খ) নানা ধরনের আশা-আকাঞ্চা পূরণ না হওয়া এবং (গ) পরকালের সম্বল অর্জন না করা। দুনিয়াদার বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন, হাঙ্কা বোঝা বহনকারী কম কষ্ট পায় এবং কদাচিত্বিপদাপন্ন হয়। কিন্তু ভারী বোঝা বহনকারীরা বেশি কষ্ট পায়, তাদের ধৰ্মসের আশংকা থাকে। তাঁর মতে যে আল্লাহকে চিনেছে সে আল্লাহর সঙ্গে দোষ্টী করেছে। আর যে দুনিয়াকে চিনেছে সে আল্লাহর সঙ্গে শক্রতায় নিয়োজিত হয়েছে। তাঁর মতে “আল্লাহর প্রেম রাজ্যে একাকী বাস করা ভাল।” যাঁরা দুনিয়াকে শুধু একটি আমানতের মালের মতো মনে করেন, তাঁরা প্রয়োজনকালে অনায়াসে এটা আমানতের মালিকের হাতে সোপাদ করে চলে যেতে পারেন। তাঁদের মনে কোনরূপ দুঃখ-অশান্তির সৃষ্টি হয় না।

হ্যরত হাসান বসরী (রহঃ) উল্লেখ করেন, তিনি ধরনের লোকের গীবত করা সিদ্ধ রয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তির সমালোচনাকে গীবত বলা যাবে না। যেমন, (১) ইন্দ্রিয়াসঙ্গ লোভী, (২) প্রকাশ্য ও প্রতিনিয়ত অসদাচারী (৩) নিষ্ঠুর অত্যাচারী শাসক ও নেতা।

একবার হ্যরত হাসান বসরী (রহঃ) এক মাহফিলে ওয়াজ করছিলেন। ঠিক এ সময়ে হাজাজ বিন ইউসুফ একদল সৈন্যসহ খোলা তরবারি হস্তে সেদিকে আসেন। সে সময়ে হাজাজ বিন ইউসুফকে নির্মম কর্মকাণ্ডের জন্য সকলেই ভয় করত। এ কারণে জনৈক শ্রোতা নিম্নস্বরে অপর শ্রোতাকে বলেন, “আজ হাসান বসরীর (রহঃ) পরীক্ষা হয়ে যাবে। দেখা যাবে হাজাজের সম্মানে তিনি ওয়াজ বন্ধ করে নীরব হয়ে যান কিনা। একটু পরে হাজাজ সভাস্থলে প্রবেশ করে এক পাশে বসে পড়েন। হ্যরত হাসান বসরী (রহঃ) সেদিকে কোন প্রকার জ্ঞানে নাকরে নির্ধারিত বিষয়ের উপর ওয়াজে লিপ্ত থাকেন। ওয়াজ শেষ হলে হাজাজ উঠে গিয়ে হ্যরত হাসান বসরীর (রহঃ) হস্ত চুম্বন করে বলেন, “যদি কারও

সত্যিকার অলি দেখার ইচ্ছা থাকে, তবে সে যেন হাসান বসরীকে (রহঃ) দেখে নেয়।”

হ্যরত হাসান বসরী (রহঃ) ছিলেন তাসাওউফের একটি বিশেষ সিল-সিলার নেতৃত্বানীয় শায়খ। তার সিলসিলার বিশ্বখ্যাত অলিদের অন্যতম হলেন সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ, আতায়ে রাসূল হ্যরত খাজা সৈয়দ মঙ্গলুন্দিন চিশ্তি আজমিরী সঞ্জৰী (কঃ)।

উপর্যুক্ত তাসাওউফ নেতৃত্বের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাপরেখা, সাধনা রীতি, আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের পছায় স্বতন্ত্র ধারা রয়েছে। হ্যরত ওয়ায়েস করণীর (রহঃ) মধ্যে কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধন, সংসার বিমুখতা, প্রেম উদ্দামতার প্রাধান্য লক্ষ্যণীয় ছিল। হ্যরত ইমাম জাফর সাদেকের মধ্যে আহলে বাইত থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের গভীরতা, ইবাদতে বিশুদ্ধতা, সুউচ্চ নৈতিকতা, ওয়ারেসে নবুবীর আভিজ্ঞাততা, সর্বোপরি নীরব ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের তৎপরতা লক্ষ্যণীয় ছিল। হ্যরত হাসান বসরীর (রহঃ) মধ্যে সুফি চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি হৃদায়তের পছা হিসেবে সভা-সমাবেশ প্রাধান্য পেয়েছিল। মাইজভাওর দরবার শরিফ আল্লাহ অব্বেষণের সকল পছাকে যথার্থ মূল্যায়নে রেখে মানব সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিশ্বাস এবং পছন্দ অনুযায়ী তৃরিকা গ্রহণের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। মাইজভাওর শরিফের এ পছাকে বলা হয় ‘জামে উত্ত তনজিহ ওয়া ওশবীহ।’ (চলবে)

সুফি উদ্ধৃতি

- চোখের পর্দাই হল সর্বাপেক্ষা বড় পর্দা, যার দ্বারা লোক শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতি দৃষ্টি নিষ্কেপে বাধাপ্রাপ্ত হয়।
- খাদ্য ভর্তি উদরে কখনও জ্ঞান ও বুদ্ধির স্থান হয় না।
- পরহেজগারীর ধনে যার অন্তর পূর্ণ, সেই বড় ধনবান।

—হ্যরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ)

- আরিফের জন্য যা অবশ্য পালনীয়, তা হল মাল-দৌলতের প্রতি নিষ্পত্তি থাকা, বেহেশ্তের ভরসা না রাখা ও দোষখের পরোয়া না করা।

—হ্যরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ)

আলোকধারা বুক্স এর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ

হ্যারত গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারীর (কং) জীবন ও কর্মে
তাওহীদে আদীয়ান (আন্তিক্যবাদীদের সহাবস্থান)।

শাহানশাহ হ্যারত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং)

ট্রাস্ট প্রকাশন-

আলোকধারা বুক্স - এর পক্ষে

প্রকাশক

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

গাউসিয়া হক মন্ডিল

মাইজভাণ্ডার শরিফ

ডাক: ভাঙার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২

লেখক

অধ্যাপক জহর উল আলম

প্রথম প্রকাশ : ১০ মাঘ, ২৩ জানুয়ারি ২০১৮

প্রচ্ছদ:

ইমেজ সেটিং

মুদ্রণ:

দি আলোকধারা প্রিন্টার্স

এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট

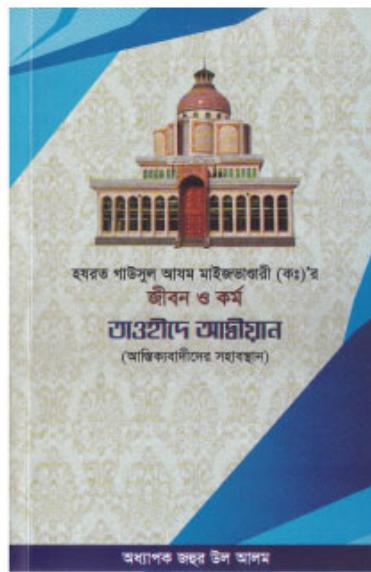
ডিউ উদয়ন (১৩তলা)

বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক,

চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

মূল্য: ৭০

ISBN:978-984-92208-3-1



ইসলাম, তাসাওউফ ও মাইজভাণ্ডারী দর্শন এবং পীর-মুরিদ

সম্পর্ক

শাহানশাহ হ্যারত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং)

ট্রাস্ট প্রকাশন

আলোকধারা বুক্স-এর পক্ষে

প্রকাশক

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

গাউসিয়া হক মন্ডিল

মাইজভাণ্ডার শরিফ

ডাক-ভাঙার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২

প্রথম প্রকাশ:

জানুয়ারি ২০১৮

প্রচ্ছদ:

ইমেজ সেটিং

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

মুদ্রণ: দি আলোকধারা প্রিন্টার্স

এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট

ডিউ উদয়ন (১৩তলা)

বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক,

চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

মূল্য: ৫০ টাকা মাত্র।

ISBN 978-984-92208-5-5

সূচিপত্র:

গবেষণা ও প্রকাশনা পর্ষদ সভাপতির বক্তব্য

প্রসঙ্গ কথা:

ভূমিকা:

প্রথম অধ্যায়

মহান আল্লাহর ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণা এবং আনুগত্য
প্রকাশই তাওহীদ

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাওহীদে আদীয়ান নীতিমালা

তৃতীয় অধ্যায়

তাওহীদে আদীয়ান কী?

চতুর্থ অধ্যায়

মহানবী হ্যারত মুহাম্মদ (দঃ): তাওহীদে আদীয়ান
এবং সমগ্র মানবকুলের এক্য প্রসঙ্গ

পঞ্চম অধ্যায়

তাওহীদ সম্পর্কে তাসাওউফ ব্যক্তিত্ব এবং ফকীহদের
অভিমত

ষষ্ঠ অধ্যায়

আধুনিক ফকীহদের (গবেষক) দৃষ্টিভঙ্গী

সপ্তম অধ্যায়

মযহাবে ইশ্ক অনুযায়ী তাওহীদে আদীয়ান

অষ্টম অধ্যায়

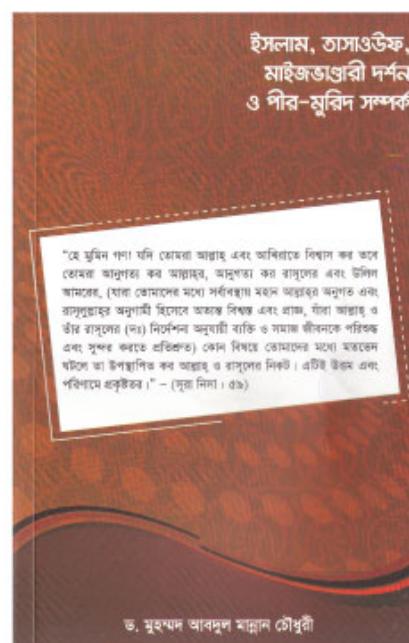
মাইজভাণ্ডার শরিফ: তাওহীদে আদীয়ান এবং বৈশিক
পরিস্থিতি প্রসঙ্গ

নবম অধ্যায়

তাওহীদে আদীয়ান : ধর্ম সাম্য, ধর্মীয় স্বাধীনতা,
বিচারসাম্য, মানবসাম্য

সূচী:

১. ইসলাম ও তাসাওউফ	৫
২. প্রকৃত পীরের পরিচয়	২৫
৩. পীরের আবশ্যকীয়তা এবং পীর মুরিদের সম্পর্ক	৩২
৪. আল্লাহর অলিগণ ইন্তিকালের পরেও সশরীরে	
বর্তমান এবং সমভাবে সক্রিয়	৪৮



ত, মুহাম্মদ আবদুল হায়ান চৌধুরী

মাওলানা সৈয়দ আবদুল হাদী কাষ্ণপুরী : মাইজভাণ্ডারী গান সমষ্টি
শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) ট্রাস্ট
প্রকাশন
আলোকধারা বুক্স-এর পক্ষে

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
গাউসিয়া হক মন্জিল
মাইজভাণ্ডার শরিফ
ডাক-ভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২

সম্পাদনা
ড. সেলিম জাহাঙ্গীর

প্রথম প্রকাশ:
২৪ ডিসেম্বর ২০১৭

স্বত্ত্ব: আলোকধারা বুক্স

প্রচ্ছদ: ইমেজ সেটিং

মুদ্রণ: দি আলোকধারা প্রিন্টার্স
গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ শরিফ
সৈয়দ সলিমুল্লাহ শাহ রোড
বিবিরহাট, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম - ৪২১১

মূল্য: ১০০ টাকা

ISBN: 978-984-92208-5-5

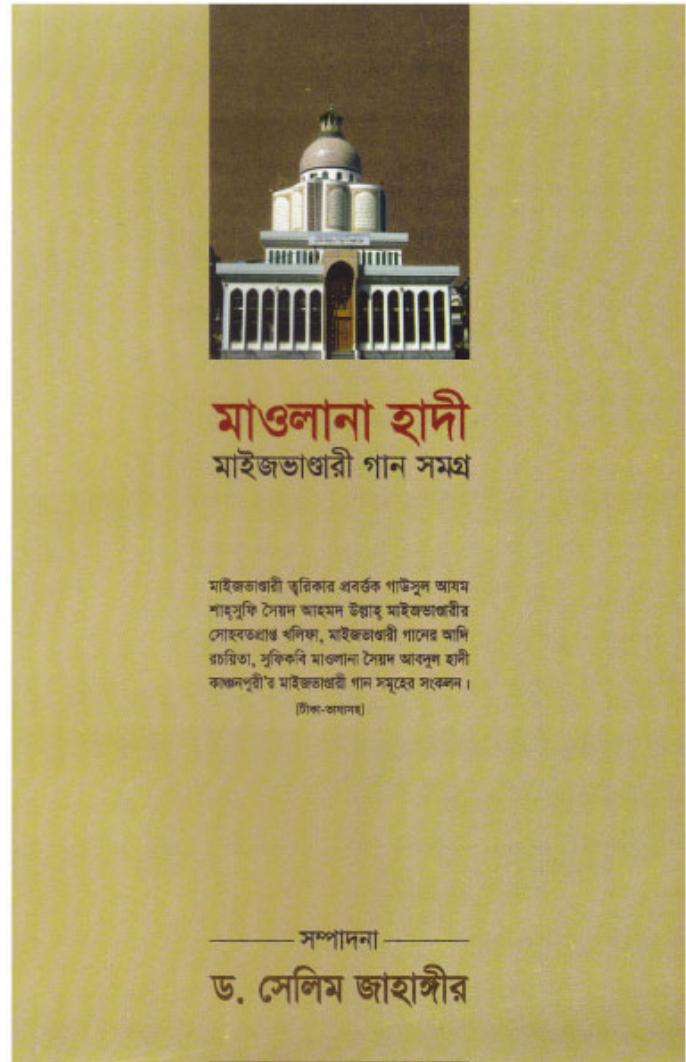
Moulana Abdul Hadi Khanchanpuri Gan Somogra (Collection of Songs) Published by Syed Mohammed Hasan on behalf of Alokdhara Books, an organ of Shahanshah Hazrat Syed Ziaul Huq Maizbhandari (KA) Trust, Gausia Huq Manzil, Maizbhandar Sharif, P.o.- Bhandar Sharif, Fatikchari, Chittagong-4352. Price: Tk. 100.00, US\$ 5.00.

সম্পাদক
ড. সেলিম জাহাঙ্গীর

সম্পাদনা সহযোগী
মাওলানা ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ
অধ্যাপক এ.ওয়াই.এম জাফর
মাওলানা মোহাম্মদ শায়েস্তা খান আল আজহারী
মোহাম্মদ শাহেদ আলী চৌধুরী

ভূমিকা
প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মাল্লান চৌধুরী

সূচিপত্র	১
প্রকাশকের কথা	৭
মুখ্যবন্ধ	৮
প্রবেশক	১২
সংকলন-সম্পাদনা প্রসঙ্গ	১৪
তৃতীয়কার বাহন হিসেবে মাইজভাণ্ডারী গান	১৫
মাইজভাণ্ডারী গান : উত্তোলন ও ত্রুট্যবিকাশ	১৭
শত বর্ষের মাইজভাণ্ডারী গানের পরিসংখ্যান	২৮
আদি রচয়িতা মাওলানা আবদুল হাদী কাষ্ণপুরী	৩৫
সর্বমোট ৯৪টি গানের টীকাভাষ্য	৪১-৫৮
ক্রমানুসারে ৯৪টি গানের প্রথম চরণের সূচি	৫৯
প্রথম চরণের ক্রমানুসারে গানসমূহ	৬২-৯৭
মাইজভাণ্ডারী সামা মাহফিলের নিয়মাবলী	৯৮
সামা মাহফিলে গীত গান প্রসঙ্গ	৯৮
নির্বাচিত গানের স্বরলিপি	৯৯-১০৫
নির্বাচিত গানের ইংরেজি অনুবাদ	১০৬
নিষ্ঠট (টীকা-ভাষ্য)	১০৭-১১২
নিষ্ঠট (গানের প্রথম চরণ)	১১৩-১১৮
এক নজরে এ গ্রন্থের মৌলিক বিশেষত্ব	১১৯
সম্পাদকের বিনীত নিবেদন	১২০



মাওলানা হাদী
মাইজভাণ্ডারী গান সমষ্টি

মাইজভাণ্ডারী কৃতিকার প্রথম গাউসুল আয়ম
শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর
সোহবতোগ্রাম খলিফা, মাইজভাণ্ডারী গানের আদি
রচয়িতা, সুক্ষিকি মাওলানা সৈয়দ আবদুল হাদী
কাষ্ণপুরী'র মাইজভাণ্ডারী গান সমূহের সংকলন।
(টীকা-অধ্যায়সমূহ)

সম্পাদনা
ড. সেলিম জাহাঙ্গীর

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কং)’র ১১২তম মহান ১০ মাঘ উরস শরিফ উপলক্ষে ‘এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট’-এর ব্যবস্থাপনায় ১০ দিন ব্যাপী কর্মসূচি



মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্ডিলস্থ পূর্ববাড়ি সম্মেলন কক্ষে ‘শিক্ষক সমাবেশ’-এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন চ.বি ফলিত ও পরিবেশ রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন।

মুসলিম ইন্সিটিউট হলে ‘মাইজভাণ্ডারী একাডেমি’ আয়োজিত ‘উলামা সমাবেশ’-এ মধ্যে উপবিষ্ট অতিথিবর্গ।



চসিক তবনস্থ ‘কে বি আবদুস সাত্তার মিলনায়তন’-এ ‘শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী বৃত্তি তহবিল’ আয়োজিত ২০১৭ পর্বের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে চসিক মেয়র আ.জ.ম নাছির উদ্দিন।

নাসিরাবাদ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ‘মাইজভাণ্ডারী একাডেমি’ আয়োজিত ‘১১তম শিশু-কিশোর সমাবেশ’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চ.বি উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী।



উরস শরিফের পরদিন ভোরবেলা গাউসিয়া হক মন্ডিল ও এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট-এর মৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর্মসূচি।



শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কং) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত বহুমাত্রিক কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:

১. মাদ্রাসা-ই-গাউসুল আয়ম মাইজভাণ্ডারী
মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
২. উম্মুল আশোকীন মুনওয়ারা বেগম এতিমখানা ও
ছিফ্যখানা, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।
৩. গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী ইসলামিক ইন্সিটিউট (দাখিল),
পশ্চিম গোমদঙ্গী ১৯নং ওয়ার্ড, বোয়ালখালী, পৌরসভা, চট্টগ্রাম।
৪. শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী
(কং) স্কুল, শান্তিরঞ্চীপ, গাহিরা, রাউজান, চট্টগ্রাম।
৫. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল
হক মাইজভাণ্ডারী, হামজারবাগ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম।
৬. শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী
(কং) ইসলামি একাডেমি, হাইদোঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৭. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া ও নূরানী
মাদ্রাসা, সুয়াবিল, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
৮. বিশ্বালি শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (কং) হাফেজিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা,
হাটপুরুরিয়া, বটতলী বাজার, বরুড়া, কুমিল্লা।
৯. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (কং) ছিফ্যখানা ও এতিমখানা,
মনোহরদী, নরসিংদী।
১০. জিয়াউল কুরআন নূরানী একাডেমি, পূর্ব
লালানগর, ছোট দারোগার হাট, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
১১. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল
হক মাইজভাণ্ডারী, সৈয়দ কোম্পানী সড়ক,
ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১২. মাদ্রাসা-ই জিয়া মওলা হক ভাণ্ডারী
পশ্চিম ধলই (রেল-লাইন সংলগ্ন), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৩. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
পাটিয়ালছড়ি, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
১৪. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী,
বৈদ্যেরহাট, ভুজপুর, চট্টগ্রাম।
১৫. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
ফতেপুর, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৬. মাদ্রাসা-ই-শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল
হক মাইজভাণ্ডারী, খিতাপচর, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৭. জিয়াউল কুরআন জামে মসজিদ ও ফোরকানিয়া
মাদ্রাসা, চরখিজিরপুর (ট্যাক্সির), বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
১৮. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
মেহেরআটি, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

১৯. জিয়াউল কুরআন সুন্নিয়া ফোরকানিয়া
মাদ্রাসা, এয়াকবুদ্দী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
২০. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা,
চন্দনাইশ (সদর), চট্টগ্রাম।
২১. হক ভাণ্ডারী নূরানী মাদ্রাসা, নূর আলী মিয়া হাট,
ফরহাদাবাদ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২২. শাহানশাহ হক ভাণ্ডারী দায়রা শরিফ
ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, চরখিজিরপুর,
বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
২৩. শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী
(কং) ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, পশ্চিম ধলই
(রেললাইন সংলগ্ন), হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
২৪. মাইজভাণ্ডার শরিফ গণপাঠ্যগার।

শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প:

- ◆ শাহানশাহ হ্যরত সৈয়দ জিয়াউল হক
মাইজভাণ্ডারী (কং) বৃত্তি তহবিল

দাতব্য চিকিৎসাস্বা প্রকল্প:

- ◆ হোসাইনী ক্লিনিক (মাইজভাণ্ডার শরিফ)।

দরিদ্র বিমোচন ও আর্থিক সহায়তা প্রকল্প:

- ◆ যাকাত তহবিল।
 - ◆ দুষ্ট সাহায্য তহবিল।
- মাইজভাণ্ডারী আদর্শগত গবেষণা ও প্রকাশনা প্রকল্প:**
- ◆ মাইজভাণ্ডারী একাডেমি। ◆ আলোকধারা বুকস্
 - ◆ মাসিক আলোকধারা।

আত্মোন্নয়নমূলক যুব সংগঠন : তাজকিয়া।

সংগীত ও সংস্কৃতি চর্চা প্রকল্প:

- ◆ মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠী।
- ◆ মাইজভাণ্ডারী সংগীত নিকেতন।

জনসেবা প্রকল্প:

- ◆ দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, মুরাদপুর মোড়, চট্টগ্রাম।
- ◆ দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী ও ইবাদাতখানা,
নাজিরহাট তেমুহনী রাস্তার মাথা।
- ◆ দৃষ্টিনন্দন যাত্রীছাউনী, শান-ই-আহ্মদিয়া
গেইট সংলগ্ন, মাইজভাণ্ডার শরিফ।

বাস্তিক অনুষ্ঠানসমূহে:

- ◆ ন্যায্যমূল্যের হোটেল (মাইজভাণ্ডার শরিফ)
আম্যমান ওয়খানা ও ট্যালেট।